

ইসলামী উপন্যাস



শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুতীর

প্রথম প্রকাশ:

জ্বিলহজ্জ-১৪৩৮ হিজরী
সেপ্টেম্বর-২০১৭ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

bestkitab.weebly.com

almunirabdullah@gmail.com

মূল্যঃ ৮৫ টাকা।

এক.

শিমুলের মনটা ভীষণ বিরক্তিতে ভরে উঠলো। ট্রেনটা থেমেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। ছাড়ার কোনো নামই নেই। সবাই বলছে ক্রসিং হবে। লোকাল ট্রেনে উঠার এই এক ঝামেলা। আন্ত-নগর ট্রেনগুলো পেছে এসে আগে চলে যায় আর লোকাল ট্রেনগুলো ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে থেকে তাদের পার হওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। তাছাড়া গাও-গ্রাম আর বন-জঙ্গলে যতগুলো স্টেশন আছে সব জায়গায় দাঁড়াতে দাঁড়াতে দিন কাবার করে ফেলে। এমনকি স্টেশন যেখানে আদৌ নেই সেখানেও অনেক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে। এসব ভেবে গোটা রেলওয়ে ব্যবস্থার উপরই ক্ষেপে ওঠে শিমুলের মনটা।

রিয়াদ তার পাশেই বসে রয়েছে। তার মনে কিন্তু এক তিল বিরক্তির অনভূতি নেই। চলতে চলতে ট্রেন যখনই থামে রিয়াদ তখন একমনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। আপ-ডাউনের ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা যাত্রীগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে সে পুরা জগৎটাকে অনুভব করার চেষ্টা করে। এই স্বাভাবিক ও সাধারণ

দৃশ্যগুলোর মাঝে সে এমন কিছু খুঁজে পায় যা সে সারা জীবনে ভুলতে পারে না। ট্রেন দু-দশ মিনিট বা এমনকি ঘন্টা খানেক কোথাও লেট করলেও রিয়াদের তাই কোনো অসুবিধা হয় না। সত্যি বলতে কোনো কোনো দৃশ্য তার নিকট এতটাই ভালো লাগে যে কয়েক মিনিট দেখে মন ভরে না। সে সময় ট্রেনটা ছেড়ে দিলেই বরং তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। ইচ্ছা করে ট্রেনটা যদি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতো!

আজ এমনই একটা জিনিস তার চোখে পড়েছে। এমন কোনো আহামরি ব্যাপার নয় সেটা। কিন্তু রিয়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দারুণভাবে। প্লাটফর্মের এক পাশে দুই জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারা হুবহু একই রকম। তারা যে জমজ ভাই তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না। জমজ ভাইদের মধ্যে এতটা মিল থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কেনো জানি রিয়াদের মনে হচ্ছে এই দুই জন যুবকের মাঝে অতিরিক্ত কিছু মিল রয়েছে। সে ভাল করে লক্ষ্য করে, তাদের আকার-আকৃতি, পোশাক-আশাক, ভাব-ভঙ্গি সব কিছুই যেনো হুবহু অন্য জনের মতো। ঠিক যেনো মনে হচ্ছে তারা একই জনের

দুটো প্রতিকৃতি। অনেক্ষণ ধরে রিয়াদ মনে মনে তাদের নিয়ে একটা খেলা করছে। তাদের মধ্যে কোনো অমিল পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখছে। কিন্তু এখনও সে সফল হতে পারে নি। মাথার পাগড়ি আর মুখের দাড়ি থেকে শুরু করে, পাঞ্জাবী, পায়জামা হয়ে পায়ের জুতা পর্যন্ত সব কিছুতে তাদের ছব্ব মিল। গায়ের রংও একই রকম উজ্জল ফর্সা। একইভাবে হাসে আর হাসার সাথে সাথে একই রকম লাল দাত বের হয়ে আসে তাদের। অর্থাৎ দুজনেই পান খায়। দুজন মানুষের মাঝে এতো মিল থাকতে পারে!

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না সে। হঠাৎ সিট থেকে উঠে নিচে নেমে যায়। গটগট করে হেঁটে চলে যায় দুই যুবকের দিকে। কাছে গিয়ে প্রথমেই সালাম দিয়ে উভয়ের সাথে মোসাফা করে রিয়াদ। কিভাবে কথা শুরু করবে সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর উভয়ের দিকে আঙ্গুলি ইশারা করে বলে,

- আপনারা কি দুই ভাই?

কথাটা শুনে ডান দিকের ছেলেটা মুচকি হেসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু বাম দিকের ছেলেটা তাকে

বাধা দিয়ে বলে,

- না, না। আমরা মোট তিন ভাই চার বোন।

রিয়াদ কিছুটা ভেবাচেকা খেয়ে বলে,

- আমি বলতে চাচ্ছি আপনারা দুজন একে অন্যের ভাই
কিনা।

লোকটা আবারো মাথা নেড়ে বলে,

- আহা! অন্যের ভাই হবো কেনো আমরা আপন ভাই।

রিয়াদ বুঝতে পারলো, ভুল ভাবে হলেও এবার সঠিক
উত্তর পাওয়া গেছে। বোঝা গেলো, তার ধারণা সঠিক।
এরা একে অপরের ভাই। কিন্তু এতটুকু উত্তর শোনার
জন্য সে আসেনি। এতটুকু তো সে আগেই বুঝতে
পেরেছে। সে এখানে এসেছে, অন্য একটা প্রশ্ন করার
জন্য। কিন্তু সেই প্রশ্নটা একটু জটিল। আর এই লোকটা
সহজ একটা প্রশ্ন যেভাবে পাকিয়ে ফেলছে তাতে জটিল
প্রশ্ন সে বুঝতে পারবে কিনা বা বুঝতে পারলেও সহজে
তার উত্তর দেবে কিনা তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা রয়েছে।
রিয়াদ বুঝতে পারে সহজে উত্তর পেতে হলে সোজা পথে
না হেটে উল্টো পথে হাটতে হবে। সে বলে,

- আপনারা দুজন দেখতে ছবছ একই রকম।

কথাটা বলে সে ডান দিকের ছেলেটার দিকে তাকায়
যাতে এই উত্তরটা তার মুখ থেকেই আসে কিন্তু বাম
দিকের ছেলেটা প্রশ্নটা লুফে নিয়ে বলে,

- কেবল দেখতে নয়, আমরা দেখতে, শুনতে এবং গুনতে
একই রকম।

দেখার সাথে সাথে শুনতে এবং গুনতে একই রকম
হওয়ার বিষয়টা রিয়াদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সে
বলে,

- দেখতে একই রকম হওয়ার বিষয়টা না হয় বুঝলাম
কিন্তু শুনতে আর গুনতে একই রকম হওয়ার ব্যাপারটা
তো বুঝলাম না।

রিয়াদ কথাটা বুঝতে পারেনি দেখে লোকটা ভীষণ খুশি
হয়। কথার প্যাঁচে ফেলে মানুষের মাথা আওলিয়ে
দেওয়াই হয়তো তার অভ্যাস। এক গাল হেসে পান
খাওয়া লাল দাঁতগুলো প্রদর্শন করে বলে,

- শুনতে একই রকম কারণ আমাদের দুজনের কণ্ঠ
একই রকম। আর গুনতে একই রকম কারণ আমাদের

উভয়ের দুই হাতে ছয়টি করে আঙ্গুল।

কথাটা বলে নিজের দুই হাত মেলে ধরতেই রিয়াদ লক্ষ্য করে উভয় হাতে বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশে ছোট্ট একটা আঙ্গুল সহ মোট ছয়টি করে আঙ্গুল। অন্য জনের হাতেও এমন ছয়টি করেই আঙ্গুল আছে কিনা সেটা দেখার জন্য তাকাতেই সে হাত লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু তার আগেই তার ডান হাতের ছয়টি আঙ্গুল রিয়াদের নজরে পড়ে। সেই সাথে সে উভয়ের মাঝে একটা অমিলও আবিষ্কার করে ফেলে। একজন লাজুক স্বভাবের আর অন্য জন বেহায়া প্রকৃতির। তাছাড়া একজন বাচাল আর অন্যজন মিতভাষী। এত মিলের মাঝেও দুজনের মাঝে কিছু একটা অমিল আবিষ্কার করে তার মনটা বেশ প্রশান্তি পায়। আরও কিছু অমিল আছে কিনা সেটা জানার জন্য তার মনটা বেকুল হয়ে ওঠে। কথা বেশি যে বলে তাকে ক্ষেপাতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে এমন ভেবে এবার সে বাচাল লোকটার উদ্দেশ্য বলে,

- অনেক্ষণ ধরে আমি আপনাদের মাঝে কোনো একটা অমিল খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো মতেই

পারছি না। আপনিও হয়তো কোনো অমিলের কথা বলতে পারবেন না।

লোকটা রেগে উঠে বলে,

- পারবো না মানে? অবশ্যই পারবো।

শিকার টোপ গিলেছে দেখে রিয়াদ উৎসাহী হয়ে বলে,

- তবে বলুন না দুই একটা।

লোকটা বলে,

- এই যেমন ধরুন, আমার নাম আতিক আর এর নাম আ'তিক।

দুজনের নাম শুনে রিয়াদের চোখ তো ছানা বড়া হওয়ার মতো অবস্থা। আতিক আর আ'তিকের মাঝে কি পার্থক্য সেটা সে আদৌ ধরতে পারে না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে বলে,

- এমন নাম কিভাবে হলো?

লোকটা বলে,

- সে এক লম্বা কাহিনী। আমার বাবার বারবার কন্যা

সন্তান হতো। তাই তিনি মানত করেন। পুত্র সন্তান হলে তার নাম রাখবেন আতিক। সেবার পুত্র সন্তান হলো বটে কিন্তু সন্তান হলো একবারে দুটো। বাবা পড়ে গেলেন ভীষণ মুশকিলে। দুইজনের নাম একই রাখা যায় না আবার মানত পুরা না করলেও হয় না। তখন এলাকার সব ছজুররা বৈঠকে বসে একটা ফন্দি বের করলেন। বললেন, একজনের নাম হবে আইন যুক্ত আতিক আর অন্য জনের নাম হবে হামযা যুক্ত আতিক।

রিয়াদ ঠোট উল্টিয়ে বলে,

- কিন্তু এই আতিক আর আতিকে পার্থক্য কি?

বাচাল লোকটা রাগত স্বরে বলে, আতিক হলো, আইন হরফ দিয়ে আর আতিক হলো আলিফ হরফ দিয়ে। আলিফে আর আইনে কত পার্থক্য সেটা কি আপনার জানা আছে?

রিয়াদ মাথা নাড়ে। তার জানা নেই। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত কারো পক্ষে দুটো আরবী হরফের মাঝে কি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তা জানা সম্ভব নয়। তাকে মাথা নাড়তে দেখে লোকটি আবারো হেসে বলে,

- বিয়ে করেছেন?

প্রশ্ন শুনে রিয়াদ ভেবাচেকা খেয়ে যায়। আলোচনার সাথে এই প্রশ্নের সম্পর্ক কি তা সে বুঝতে পারে না। কেবল হালকাভাবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় সে বিয়ে করেনি।

- করলে বুঝতেন। বিয়েতে দেনমোহর দুইরকম হয়। মুআ'জ্জাল আর মুয়াজ্জাল। শুনতে এক রকম মনে হলেও এর একটার অর্থ বাকী আর অন্যটার অর্থ নগদ। বুঝলেন?

রিয়াদ কিছুই বোঝে না কেবল বলে,

- আতিক বলে ডাকলে কাকে ডাকছি বুঝবেন কিভাবে?
লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে,

- আইন যুক্ত আতিককে ডাকার সময় হলক্ব থেকে উচ্চারণ করলেই হলো। তাও যদি না পারেন তাহলে আমাকে বলবেন বড় আতিক আর ওকে বলবেন ছোট আতিক। আমি ওর চেয়ে কয়েক মুহূর্তের বড় কিনা!

এতক্ষণে বিষয়টা রিয়াদের কাছে কিছুটা সহজ মনে হয়।
সে বলে,

- আচ্ছা এটা না হয় কোনো মতে বুঝলাম। অন্য কোনো অমিল আছে কি?

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে লোকটা বলে,

- আছে মানে? ঢের আছে। একটা অমিল হলো, আমি পড়তে পড়তে ঘুমায় আর ও ঘুমাতে ঘুমাতে পড়ে। আরেকটা অমিল হলো, আমি পান দিয়ে জর্দা খাই আর ও জর্দা দিয়ে পান খায়।

রিয়াদের মাথা আবারো ঘুরে যায়।

- এও তো সেই একই ব্যাপার।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলে,

- মোটেও এক নয়। আমার পড়তে ইচ্ছা করে না কিন্তু বই না পড়লে ঘুম আসতে চাই না। তাই ঘুমানোর সময় বিছানায় শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমানোর চেষ্টা করি। এই হলো বই পড়তে পড়তে ঘুমানো। আর ও হলো বইয়ের পোকা। সারাক্ষণ বই পড়ে। গভীর রাতে যখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তখনও আধা জাগ্রত আর আধা ঘুমন্ত অবস্থায় বই পড়ে। এই হলো ঘুমাতে ঘুমাতে বই পড়া।

রিয়াদ এই পার্থক্যটা ধরতে পারে। একটু উৎসাহিত হয়ে বলে,

- আর জর্দার ব্যাপারটা।

লোকটা হেসে বলে,

- সেটা আরও সহজ। ঐ যে বললাম আমার ঘুম আসে না। তাই ঘুমের ভাব আনার জন্য আমি প্রচুর পরিমাণে জর্দা খায়। কিন্তু পীর বাবা আমাকে শুধু জর্দা খেতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, এমনিতে জর্দা খাওয়া হারাম হবে তবে পানের সাথে খাওয়া যাবে। তাই আমি অল্প একটু পানের পাতা জর্দার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জর্দা খায়। আর ও তো জর্দা খেতেই চায় না। আমিই মাঝে মাঝে জোর করে যখন খাওয়াই তখন এক গাদা পানের সাথে অল্প একটু জর্দা মিশিয়ে নিয়ে খায়।

এই ব্যাখ্যাটিও রিয়াদের পছন্দ হয়। তবে কথার মধ্যে পীর বাবার প্রসঙ্গ আসায় আলোচনার মোড় ঘুরে যায়।

- কোন পীর বাবা? কি তার পরিচয়?

- আমার পীর রহমত আলি, তার পীর কারামত আলী, তার পীর মেরামত আলী

লোকটি এক নাগাড়ে বলতে থাকে এমনকি শেষে হাসান
বসরী ও আলী ﷺ এর মাধ্যমে আল্লাহর রসূল পর্যন্ত নাম
উল্লেখ করে একটু থেমে বলে,

- বাবা আদাম পর্যন্ত বলবো?

রিয়াদ আতংকে উৎকর্ষিত হয়ে বলে,

- না, না। তার দরকার নেই। এতটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট
হবে।

ট্রেন থেকে শিমুল রিয়াদের কার্যকলাপ অবাক হয়ে লক্ষ্য
করলো। ট্রেন থেকে নেমে গিয়ে দুই জন মোল্লার সাথে
সাক্ষাত করা, মোসাফা করা, গল্প-গুজবে মেতে ওঠা
এসব দেখে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। তার দাদা
কমরেড মুজিবুল হক এসব একেবারেই পছন্দ করেন
না। একজন পাঁকা নাস্তিক হিসেবে নিজের ছেলে-সন্তান
ও নাতি-নাতনীদের তিনি বেশ কড়া শাসনের মধ্যে
রাখেন। নামাজ পড়া তো দূরের কথা আল্লাহর নাম
উচ্চারণ করতে শুনলেই লাঠি হাতে তেড়ে আসেন।
রিয়াদ আজকে যা কিছু করলো সেগুলো শুনলে তিনি
হঠাৎ করে হার্টফেল করবেন কিনা সেটাও বলা মুশকিল।

মৌলবীদের সাথে কথা বলা বা মোসাফা করা নাস্তিকদের আইনে অতিশয় বড় অপরাধ। নাস্তিকতার ধর্মে ওজু-গোসলের বিধান থাকলে মোল্লাদের সাথে মোসাফা করলে ওজু ভঙ্গ হতো। আর কোনো মোল্লাহর সাথে কোলাকুলি করলে গোসল ফরজ হতো। কিন্তু তেমন কোনো বিধান নেই। তবে তার দাদা মুজিবুল হক শাস্তি স্বরূপ যে কোনো আদেশ দিতে পারেন। যেমন শীতকালে ঠান্ডা পানিতে নেমে গোসল করা বা গরম কালে তপ্ত রোদে দাঁড়িয়ে থাকা। শিমুল নিজে হয়তো ভাইয়ের ব্যাপারে দাদার নিকট নালিশ করবে না কিন্তু দাদার পরিচিত কোনো ব্যক্তি দেখে ফেললে বিপদ। সাথে সাথে দাদার কানে খবর চলে যাবে আর বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে। তাছাড়া শিমুল নিজেও দাদার মতোই একজন পাঁকা নাস্তিক। তাই এভাবে রাস্তার মাঝে জনসম্মুখে দুজন ছজুরের সাথে রিয়াদের খোশ গল্পের বিষয়টিকে সে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কিছুক্ষণ নিরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে শেষে না পেরে নিজেই নেমে গিয়ে রিয়াদের হাত ধরে বলে,

- এখনই চল, ট্রেন ছেড়ে দেবে।

ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হতে যাবে এমন সময় দুজন যুবকই পকেট থেকে রশিদ বই বের করে উভয়েই একইসাথে বলে উঠলো,

- টাকা-পয়সা, ফল-ফসল, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি যে যা পারেন দান করুন।

এতক্ষণের বাক্যালাপে যতটুকু সৌজন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণেই হয়তো রিয়াদ কিছু দান করার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলো কিন্তু শিমুল হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ট্রেনের দিকে টেনে নিয়ে গেলো। নাস্তিকতার আইনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করা চূড়ান্ত পর্যায়ে অপরাধ। এটা নাস্তিকতা থেকে বের হয়ে ধর্মাত্মক হয়ে যাওয়ারই শামিল। আপন ভাইকে এহেনো নিকৃষ্ট কাজ সে করতে দেবে না। অগত্যা রিয়াদ শিমুলের সাথে ফিরে গিয়ে নিজেদের সিটে বসে পড়লো। সেখানে বসে এক পলকে তাকিয়ে থাকলো দুই যুবকের দিকে। যাদের একজনের নাম আতিক আর অন্য জনের নাম আতিক। উভয়ে রশিদ হাতে বিভিন্ন লোকের কাছে যাচ্ছে আর এক নাগাড়ে দান করার কথা বলে চলেছে। রিয়াদ তাদের মাঝে আরো একটা মিল খুঁজে পেলো। তারা

উভয়েই একই মাদ্রাসার ছাত্র। সেই সাথে সে এটাও বুঝতে পারলো যে, তার পূর্বের সিদ্ধান্তে বড় রকমের ভুল ছিলো। এদের কেউই লাজুক বা মিতভাষী নয় বরং উভয়ে সমান বেহায়া ও বাচাল। যেভাবে মানুষের কাছে দান চেয়ে বেড়াচ্ছে তাতে লজ্জাবোধ থাকলে তা করা যায় না। বাচাল না হলেও হয় না। তবে কি এদের মাঝে আসলেই কোনো পার্থক্য নেই। পুরোনো প্রশ্নটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রশ্নটা তার নিকট এতো গুরুত্বপূর্ণ কেনো মনে হচ্ছে সেটাই সে বুঝতে পারে না।

দুই.

বাড়ি ফিরতেই দেখা গেলো দাদা চিন্তিত মনে বারান্দায় পায়চারি করছেন। তাদের দেখেই ধমক দিয়ে বললেন,

- কি ব্যাপার, এতো দেরি কেনো?

দাদার মুখে এমন কথা শুনে রিয়াদ ভীষণ অবাক হলো। এখানে অবাক হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত আজ এমন কিছু দেরি হয়নি তাদের। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। তাছাড়া তার দাদা বাক ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

কমপক্ষে নিজে তেমনই দাবী করেন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করে তিনি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরন করেছেন এটা সত্য কথা কিন্তু সেটা বাদ দিলে নাতি নাতনীদের অন্য কোনো ব্যাপারে বলতে গেলে কোনো খোঁজ খবরই রাখেন না। উল্টো গর্ব করে বলেন, যে যার মতো স্বাধীনভাবে চলবে এটাই আমার নীতি। তার এই উদাস নীতির কারণে বেশ কিছু দূর্নীতি এই পরিবারে ঘটে গেছে। রিয়াদের চাচাতো ফুফাতো ভাইদের মধ্যে কয়েকজন এখন গাজা আর হিরোইনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর দুজন চাচাতো বোন এমন লোকের হাত ধরে ভেগে গেছে যাদের নাম শুনলে এমনকি বাক ও কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দাদাজানও বেশ জোরে নাক শিটকে ওঠেন। মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করে বলেন, মিতা আর লতা জমিদার বংশের মুখে চুনকালী মাখিয়ে দিয়েছে। চুনকালী তারা মাখিয়েছে বটে কিন্তু তাতে দাদাজানের মুখ মোটেও কালো হয়নি। কেবল চুনকালী নয় তার মাথা নেড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে দিলেও তিনি নিজের আদর্শ ও নীতি থেকে পিছপা হওয়ার পাত্র নন। তাই বাক ও কর্মের স্বাধীনতার

আদর্শকে তিনি আজও বুকে লালন করেন। এখন অবশ্য চুনকালী মাথার ভয়ে নাতনীগুলোর দিকে কিছুটা খেয়াল রাখেন কিন্তু নাতিদের দিকে চোখ তুলেও তাকান না কখনও। গভীর রাতে বাড়ি ফিরলে বা এমনকি রাতে আদৌ বাড়ি না ফিরলেও তিনি গায়ে মাখেন না।

অতএব আজ সন্ধ্যা রাতে রিয়াদ আর শিমুলকে বাড়ি ফিরতে না দেখে হুমকি ধামকি দেওয়ার বিষয়টি একটু বেমানাই লাগে। কিন্তু তখনই তার আসল ব্যাপার মনে পড়ে যায়। আজ তাদের বাড়িতে নাস্তিকতা বিষয়ক সেমিনার রয়েছে। দাদাজানের একটা বাতিক হলো, রোজা, ঈদ বা অন্য কোনো যোগে নাতি-নাতনীরা একত্রিত হলেই তিনি তাদের জড়ো করে নাস্তিকতার উপর বাধ্যতামূলক লেকচার শোনান। বছরে এমন দু'চারটে বড় আয়োজন আর মাসের মধ্যে কয়েকবার ছোট-খাটো মিটিং হয় তাদের বাড়িতে। এসব মিটিংএ দাদা বক্তব্য দেন আর সেই বক্তব্য শুনে তার নাতি-নাতনীদের কেউ কেউ মুগ্ধ হলেও বাকী সবাই যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলার নেই। তাহলে তিনি তিরস্কার সহ কমিটি থেকে বহিস্কার করে

ছাড়বেন।

নাস্তিকতার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে দাদা একটা কমিটি খুলেছেন। তার নাম দিয়েছেন, “নাস্তিকদের পারিবারিক কমিটি” সংক্ষেপে “নাপাক”। নামটি যখন প্রথম ঠিক করা হয় তখন কয়েকজন আপত্তি করে বলে,

- নাপাক মানে তো খারাপ জিনিস। নামটা বদলে দিলে হয় না?

তাদের কথা শুনে দাদা হুংকার ছেড়ে বলে উঠলেন,

- নাপাক মানে খারাপ জিনিস এটা তোরা কোথায় পেলি?

দাদা যখন জেরা করে তখন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে ভীষণ বিপদ। সেই বিপদ থেকে বাঁচার তাগিদেই তাদের একজন আমতা আমতা করে বলে,

- ফোর-ফাইভের ইসলাম শিক্ষা বইতে লেখা ছিলো।

এতদূর শুনতেই দাদার মস্তিষ্কের টেম্পারেচার এতদূর পৌঁছালো যা সেলসিয়াস বা ফারেনহাইট কোনো স্কেলেই মাপা যায় না। ভীষণ জোরে ধমক দিয়ে বললেন,

- তোরা বলতে চাস সারাটা জীবন নাস্তিকতার চর্চা করে

শেষে ইসলাম ধর্মের এই পাক নাপাকের শিক্ষা আমাকে মেনে নিতে হবে? দুনিয়ার কোনো কিছু কি নাপাক আছে? সবই প্রকৃতির দান। সব কিছুই রয়েছে যথাযোগ্য সম্মান। সকল মানুষ যেমন সমান তেমনই সকল বস্তুও সমান। নাস্তিকতার এই সমতার শিক্ষাকে পরিত্যাগ করে তোরা আমাকে ইসলাম ধর্মের অসমতার শিক্ষা গ্রহণ করতে বলছিস?

দাদার কথার উপর সাধারণত কেউ কথা বলার সাহস পায় না। ইংরেজ আমলে তার পূর্ব পুরুষ জমিদার ছিলো। কয়েক হাজার বিঘা সম্পত্তি ছিলো তাদের। এখন তার সিংহভাগই লাটে উঠেছে। আর জমিদারী প্রথার তো বিলুপ্তিই ঘটে গেছে। তবু তার জমিদারী ভাব-ভঙ্গী আজও টিকে আছে। রেগে গেলে আজও তিনি বলে ওঠেন, তোকে আমি বন্দি করবো, শূলে চড়াবো ইত্যাদি। তাই পাক ও নাপাকের মাঝে সমতায়নের নীতিকে ঘোরতর দুর্নীতি জানার পরও তার বিপক্ষে সেদিন নাস্তিকদের পরিবারিক কমিটির সদস্যদের কেউই কোনো আপত্তি করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই সেই থেকে কমিটির প্রশিক্ষণ নাম হয়েছে, “নাপাক”। আর তারা সবাই হয়েছে

সেই নাপাক কমিটির সদস্য। এমন একটা নাম যা মানুষের সামনে উচ্চারণও করা যায় না। দাদাজান সেই কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারী এবং ক্যাশিয়ার এই তিনটি পদ অধিগ্রহণ করেছেন। আর বাকী পদগুলো অন্যান্য সদস্যদের মাঝে যোগ্যতা অনুযায়ী বন্টন করেছেন। এই কমিটির এখন গোটা বিশেক সদস্য রয়েছে। প্রত্যেকের মাসিক ভাতা নির্ধারন করা আছে। পূর্বপুরুষদের জমিদারীর যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা থেকে দাদা এখনও প্রচুর আয় উপার্জন করেন। কিন্তু খরচের কোনো খাত নেই। সেকেলে মানুষ হিসেবে তার না আছে টিভি-ফ্রীজ বা স্মার্টফোনের প্রতি ঝোক আর না আছে প্রেম করে প্রেমিকার পিছনে অকাতরে অর্থ কড়ি ঢালার প্রবনতা। কিন্তু তার নব্য যুগের নাতি-নাতনীদেব মধ্যে এসব কাজে ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ রয়েছে। নানা কাজে ব্যয় করার জন্য তাদের প্রচুর পয়সা-কড়ির দরকার। দু'একটা টিউশনী করে আর বাবা-মাকে মিথ্যা বলে তারা নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু খরচের খাত এতটাই বেশি যে এতে কুল দেয় না। তখনই তারা দাদাজানের কাছে হাত পাতে। কিন্তু তাদের দাদা ঝানু রাজনীতিবিদ। এমনি এমনি টাকা-পয়সা ব্যয়

করা তার অভ্যাস নয়। টাকা পেতে হলে তার কমিটিতে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে। মাঝে মাঝেই তার বাড়ি এসে মূল্যবান লেকচারের সাথে সাথে নানা কারণে তিরস্কার ও বহিষ্কারের কষ্ট সহ্য করতে হবে। এই হলো, দাদাজানের নাপাক কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

যাই হোক সেই “নাপাক” কমিটির আজ একটা জরুরী বৈঠক রয়েছে। কিন্তু রিয়াদ সেটা পুরা ভুলে বসে আছে। কিন্তু একথা দাদাকে বলা যাবে না। তাহলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবেন। বলবেন,

- তুই আমার কমিটিকে অবহেলা করিস বলেই মিটিং এর কথা ভুলে বসে আছিস। তোর ভাতা আগামী মাস থেকে অর্ধেক কতন করা হলো।

এসব কাজে রিয়াদের চেয়ে শিমুলের মাথা অধিত দ্রুত চলে। সে বলল,

- আমরা কি আর দেরি করেছে, ট্রেনটাই তো লেট করলো। আন্তঃনগর ট্রেনগুলো আগে চলে যায় আর লোকাল ট্রেনগুলো পিছনে পড়ে থাকে। এই অসমতার কারণেই আজ আমাদের এতো দেরি হলো।

তার কথায় দাদার রাগ পড়ে গেলো। বিড়বিড় করে বললেন,

- পুঁজিবাদীদের শাসন ব্যবস্থায় সব কিছুতেই অনিয়ম।
কবে যে দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে শ্রেণী বৈষম্য দূর
করে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে!

বিড়বিড় করে কথাটা বলে আবারো ধমক দিয়ে বললেন,

- যা, যা। দ্রুত তৈরী হয়ে সভা কক্ষে হাজির হয়ে যা।

হাত-মুখ ধুয়ে সভাকক্ষে হাজির হয়ে যা দেখলো তাতে
রিয়াদের চোখ চড়কগাছে উঠে গেলো। পুরা সভাকক্ষটা
খালি পড়ে আছে। নাপাক কমিটির সদস্যদের কেউই
আসেনি। কেবল রিয়াদের ফুফাতো বোন মীরা ছাড়া। এই
মেয়েটা এক নম্বরের তেলবাজ। দাদাকে তেল মেরে
মেরে নিজের মাসিক ভাতা বহু গুনে বাড়িয়ে নিয়েছে।
মিটিং এর দিন ঝড়-বৃষ্টি, রোগ-বালাই ইত্যাদি যত
সমস্যাই থাক অন্য কেউ হাজির না হলেও সে নিশ্চিত
হাজির হবে আর এর ওর নামে কান ভাঙানি দিয়ে
দাদাজানের মনতুষ্টি করার চেষ্টা করবে। নাপাক কমিটির
সদস্যদের কেউ যদি তার সামনে মনের ভুলেও আল্লাহ-

রসুলের নাম মুখে উচ্চারণ করে ফেলে তবে আর রক্ষে নেই। হয়তো তাকে ব্লাকমেইল করে চড়া অংকের ঘুস আদায় করবে নয়তো দাদাজানের কাছে নালিশ দিয়ে তার ভাতা অর্ধেক নামিয়ে আনবে। আর সেই অর্ধেক যোগ হবে তার নিজের ভাতায়। এভাবে তার ভাতা যে এখন কত তে দাড়িয়েছে তা দাদাজান আর সে ছাড়া কেউ বলতে পারে না। আজ দেখা যাচ্ছে, মীরা ছাড়া আর কোনো সদস্য মিটিংএ হাজির হয়নি। দাদাজান নিশ্চয় আজ প্রচুর রেগে যাবেন। রিয়াদ ভাবে রেগে গিয়ে তিনি যদি মিটিং বাতিল করে দেন তবে মন্দ হয় না। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধড়িবাজ লোক। মাসে একটা দিন বকবক করার সুযোগ পান। সেটা হেলায় হারাবেন না।

খানিক বাদে দাদাজান সুন্দর পোশাক পরে আর সুগন্ধি মেখে সভাকক্ষে হাজির হলেন। সভাকক্ষের অবস্থা দেখে তার মাথায় রাগ চড়ে গেলো। হুংকার ছেড়ে বললেন,

- বাকীরা কোথায়?

মীরা তৈরী ছিলো। ঠোট উন্টিয়ে বলল,

- কেউ আসেনি নানু।

দাদাজান এবার মীরার দিকে তাকালেন। তারপর আরও জোরে হুংকার ছেড়ে বললেন,

- রনিও আসেনি?

মীরার যেনো এবার টনক নড়ে গেলো। রনি হলো তার ছোট ভাই। মিটিংএ তাকে হাজির করার দায়িত্ব দাদাজান মীরার উপরই অর্পন করেছেন। সে হাজির না হলে মীরার ভাতাও তিনি কর্তন করতে পারেন। অবস্থা বেগতিক দেখে মীরার মুখটা তাই শুকনো হয়ে গেলো। তার এমন অবস্থা দেখে রিয়াদের মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠলো। কিন্তু তেলবাজ মেয়েটা ঠিক একটা ফন্দি বের করে ফেললো। বলল,

- সে তো এসেছিলো। কিন্তু অন্য কেউ আসেনি দেখে চলে গেছে।

দাদাজান এবার রিয়াদ আর শিমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- হুম। তাহলে দোষটা আসলে তাদের।

ব্যাস চাকা ঘুরে গেলো। কোথায় মীরার ভাতা কর্তন করা হবে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাদের ভাতাটাই কর্তন

করার সমূহ সম্ভাবনা। শিমুল অবশ্য সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। সে দ্রুত বলে উঠলো,

- না দাদু। দোষ মোটেও আমাদের নয়। এখনও যারা হাজির হয়নি তাদের দোষ।

কথাটা দাদাজানের বেশ পছন্দ হলো। তিনি বললেন,

- বটেই তো। তোরা তো তাও এসেছিস। কিন্তু রতন, খোকন, মনি এরা হাজিরাই দেয় নি। ওদের সবার এক মাসের ভাতা কেটে নিয়ে আমি সেটা তাদের তিনজনকে প্রদান করলাম।

রিয়াদ মনে মনে ভেবে দেখলো। নেহায়েত মন্দ নয়। বারো পনেরো জনের ভাতা তিনজনের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হলো অংকটা বেশ বড় রকমেরই হবে। সেই টাকা দিয়ে এবার সে একটা নতুন স্মার্টফোন কিনতে পারবে। মনে মনে তাই সে শিমুলের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারে না।

দাদাজান এবার আলোচকের আসনে বসলেন। আসনটা তিনি বেশ খরচ করে বানিয়েছেন এবং মাসে একদিন তার উপর চড়ে জমিয়ে আলোচনা করেন। আজ

সদস্যদের অনুপস্থিতির হার একটু বেশি হওয়ায় তার
মনটা খারাপ হলেও আসনে বসার পরপরই মনটা চাঙা
হয়ে উঠলো। প্রথমেই বললেন,

- নাস্তিকতার মূলমন্ত্র কি?

কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মীরা বলে উঠলো,

আল্লাহ-রসুল কাউকে মানিনা

কুরআন-হাদিস কিছুই বুঝিনা

সকল মানুষ সমান জানি

একেই মোরা ধর্ম মানি

ব্যাস! খুশিতে দাদার বত্রিশ পাটি দাঁত বের হয়ে
আসলো। কবিতাটা তারই লেখা। সারাটা জীবন অনেক
কষ্ট কসরত করে যে কটা কবিতা লিখেছেন এটা তারই
মধ্যে একটা। নাপাক কমিটির সদস্যদের সবাইকে তিনি
শপথবাক্যের মতো এটা মুখস্ত করানোর চেষ্টা করেন।
কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার মীরা ছাড়া অন্য কেউই এতো সুন্দর
করে কবিতাটা পাঠ করতে পারে না। এই কবিতাটা পাঠ
করলেই দাদা খুশি হয়ে যান এবং ভাতা বৃদ্ধি করেন।

আজ অবশ্য কেবল খুশি হলেন ভাতা বৃদ্ধি করলেন না।
বোঝা গেলো মীরার ভাতা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে
তার চেয়ে বৃদ্ধি করা দাদাজান সমীচীন মনে করছেন না।
যাই হোক, দাদাজান মীরার দিকে তাকিয়ে এক গাল
হেসে বললেন,

- একেবারে ঠিক উত্তর দিয়েছিস।

তারপর রিয়াদ আর শিমুলের দিকে তাকিয়ে চোখ গরম
করে বললেন,

- তোরাও বল।

দাদাজানের কথা শিরোধার্য। বলতে যখন বলছেন তখন
তো বলতেই হবে। শিমুল বলল,

আল্লাহ-রসুলকে আমরা মানিনা

কুরআন হাদীস পড়ি না

মানুষ সবাই সমান

এটাই আমাদের ধর্ম।

দাদাজান ধমক দিয়ে বললেন,

- এটা কোনো কবিতা হলো?

মীরাও নিজের ঠোটটা উল্টিয়ে দাদাজানের কথাকে সমর্থন করলো।

শিমুলও সাথে সাথেই বলে উঠলো,

- আপনি তো কবিতা বলতে বলেন নি। আপনি বলেছেন নাস্তিকতার মূলমন্ত্র কি সেটা বলতে।

দাদাজান কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন,

- তা অবশ্য সঠিক কথা। তা এবার আমার রিয়াদ বাবু কিছু বলো।

রিয়াদ বলল,

- এইটা কোনো মূলনীতি হলো! কেবল আল্লাহ রসুলের কথা বলছেন কেনো? আমরা তো, আল্লাহ-রসুল, ভগবান-ঈশ্বর, যীশু-মেরী ইত্যাদি কিছুই মানি না। আর কেবল কুরআন-হাদিসের কথাই বা কেনো বলা হচ্ছে, গীতা বা বাইবেলও কি আমরা মানি?

দাদাজান এবার একটা জটিল সমস্যায় পড়ে গেলেন। সারাটা জীবন চেষ্টা চরিত্র করে তিনি কবিতাটি

লিখেছেন। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে তার কবিতাটার মধ্যে বড় রকমের গোলমাল রয়েছে। সেটা ঠিক করতে না পারলে নাস্তিকতার মূলমন্ত্রই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু এই বুড়ো বয়সে নতুন কবিতা লেখা কি তার পক্ষে আর সম্ভব হবে? নিজের ডান হাতটি অসম্ভব জোরে ঘুরিয়ে তিনি বলেন,

- ঠিক আছে কবিতা বাদ দে। মনের কথা মুখে যে কোন ভাষায় বললেই হলো।

শিমুল এবার সুযোগ পেয়ে গেলো। বলল,

- দাদাজান তাহলে কবিতা বলার কারণে মীরার এতদিন যে ভাতা বাড়ানো হয়েছে তা কত্ন করা হোক।

দাদাজান কিছুক্ষণ নিরব থেকে বললেন,

- ঠিক আছে মীরাকে একটা সাধারণ সদস্যের সমান ভাতা প্রদান করা হবে।

কথাটা শুনে মীরার যেনো বেহুশ হওয়ার মতো অবস্থা হলো। কিন্তু সে জানে দাদাজানের সিদ্ধান্তের উপর কথা বললে ভাতা আরো কমে যেতে পারে। তাই সে নিরব থাকলো। ইতোমধ্যে দরজার দিক থেকে শব্দ শোনা

গেলো,

- দাদাজান আসতে পারি।

দাদাজান দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনুপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দু'চারজন সদস্য এখন হাজির হয়েছে। তিনি বাজখাঁই কণ্ঠে বললেন,

- না। আসতে পারো না। মিটিং এর বিষয়টা কোনো ছেলে খেলা নয় যে যখন ইচ্ছা হবে তখন আসবে।

দাদাজানের ধমক শুনে চমকে উঠলো তারা। তাদের একজন বলল,

- ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দাড়িয়েই বক্তব্য শুনি। আপনার মূল্যবান বক্তব্য শোনা তো আর বাদ দেওয়া যাবে না।

এহেনো তেলবাজীতে দাদাজান সন্তুষ্ট না হয়ে পারলেন না। বললেন,

- ঠিক আছে ভিতরে এসো। আর কখনও যেনো দেরি না হয়।

হুড়মুড় করে সবাই ভিতরে ঢুকে বসে পড়লো। দাদাজান

আলোচনা শুরু করলেন,

- এতো কষ্ট করে এই যে আমরা নাস্তিকদের পারিবারিক কমিটি গঠন করেছি তার পিছনে আসল উদ্দেশ্য কি?

কথাটা বলে তিনি বেশ কিছুক্ষণ নিরব থাকলেন যেনো আশা করছেন কেউ জবাব দেবে। কিন্তু ভুল উত্তর দিয়ে পাছে ধমক শুনতে হয় সেই ভয়ে সকলে নিরব রয়েছে। তবে একযোগে সবাই নিরব থাকাটাও সমীচীন নয়। সেক্ষেত্রে দাদাজান রেগে বোম হয়ে যাবেন। বলা যায় না ফেটেও যেতে পারেন। তাই শেষে শিমুলই তার ফুফাতো ভাই রাতুলের দিকে আঙ্গুলি ইশারা করলো কিছু একটা উত্তর দেওয়ার জন্য। রাতুলটার উপস্থিত বুদ্ধি যেমন আছে সাহসও আছে ঢের। ঠিক কিছু একটা বলে আসর ঠেকাতে পারবে। তার ইশারা পেয়ে রাতুল বলল,

- নাস্তিকদের পারিবারিক কমিটি ওরোফে ‘নাপাক’ প্রতিষ্ঠিত হয়, পারিবারিকভাবে নাস্তিকতার চর্চা করার জন্য।

কথাটা বলে রাতুলের মনে হয় সে অত্যন্ত সঠিক একটা

উত্তর দিয়েছে যা শুনে তার নানা খুশিতে গদগদ হয়ে যাবেন। কিন্তু ঘটনা ঘটলো সম্পূর্ণ উল্টো। দাদাজান এবার একটু বেশিই রেগে গেলেন।

- এমন একটা উঁচু দরের কমিটির সদস্য হয়েও তোরা এর আসল উদ্দেশ্য কি সেটাই জানিস না। আরে গাঁধা পারিবারিকভাবে নাস্তিকতার চর্চা তো কমিটি ছাড়াই করা যায়। এর জন্য কি কমিটি লাগে? এই কমিটি গঠন করা হয়েছিলো, দেশের মানুষের মাঝে নাস্তিকতার প্রচার-প্রসার করার জন্য। সেটা তোরা সবাই ভুলে গেছিস।

বিষয়টা এবার সবার মনে পড়ে। তাই তো বটে। “দেশ থেকে দেশে, আকাশে বাতাসে নাস্তিকতাকে ছড়িয়ে দিতে হবে” এটাই তো এই নাপাক কমিটির একমাত্র স্লোগান। গত মিটিংএ তো দাদাজানকে বেশ কয়েকবার স্লোগানটি দিতে শুনেছে তারা। তবে কেনো বিষয়টি কারো মনে নেই? শিমুল বিষয়টি সামলে নেওয়ার জন্য বলে,

- আসলে দাদাজান পুঁজিবাদীদের দেশে ভেজাল খাবার খেয়ে মাথার যে বেহাল দশা হয়েছে তাতে আর কিছুই মনে থাকছে না। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এসব স্মরণ রাখা যাবে কিনা সেটাই সন্দেহ।

দাদাজান পরিস্থিতি বুঝতে পারেন। তবু আক্ষেপ করে বলেন,

- কিন্তু স্মরণ না রাখলে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে কি করে?

শিমুল একথার কোনো জবাব দেয় না। দাদাজানের মাথা ঠান্ডা করাই তার উদ্দেশ্য ছিলো। সেটা যখন করা হয়ে গেছে তখন নতুন কোনো মন্তব্য করে মাথাটা আবার গরম করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। দাদাজান বললেন,

পূর্বেও বলেছি, আবারো বলছি এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য হলো, দেশের ওলীতে গলিতে নাস্তিকতাকে ছড়িয়ে দেওয়া। ঐ যে কবি বলেছেন না,

ঝরলে ঝরুক দেহের রক্ত

নাস্তিকতায় থাকবো লিপ্ত

দা'ওয়াত দেবো সকল লোকে

নাস্তিকতায় আনবো ডেকে

রিয়াদ মুখ টিপে হাসে। এই কবি স্বয়ং দাদু নিজেই।

এটা তার রচিত দ্বিতীয় কবিতা। প্রায় প্রতিটি মিটিংএ তিনি কবিতাটা দু'তিন বার পাঠ করে নাপাক কমিটির সদস্যদের উজ্জীবিত করেন। আজও তাই করলেন,

- তোমরা সবাই গাও আমার সাথে, ঝরলে ঝরুক দেহের রক্ত

সবাই কৃত্রিম আবেগের সাথে কবিতাটি গাইতে থাকে। নিতান্ত বিরক্তি ভরে রিয়াদ নিজেও মুখ মেলাতে থাকে তাদের সাথে। প্রতিদিন এভাবে শপথ নিলেও কাজের কাজ করার লোক আসলে কমই আছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই বছরেও কারো কাছে নাস্তিকতার প্রচার প্রসার করে কিনা তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। কেবল শিমুল আর রাতুলের কথা ভিন্ন। তারা ফেসবুকে নাস্তিকতা সম্পর্কে লেখে। মৌলবাদীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করে। কাউকে নাস্তানাবুদ করতে পারলে সেসব কথা আবার দাদুর কাছে এসে বয়ান করে। দাদু শুনে দুপাটি দাঁত বের করে হাসেন। কিন্তু একটি বারও ভাবেন না তর্কে নাস্তানাবুদ করা এক জিনিস আর বুঝিয়ে পথে আনা ভিন্ন জিনিস। তাই তো এতো চেষ্টার পরও নাপাক কমিটির সদস্য সংখ্যা কমছে বৈ বাড়ছে না।

কণ্ঠে অকৃত্রিম আবেগ প্রকাশ করে দাদাজান বলেন,

- নাস্তিকতা আজ একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শীঘ্রই ডাইনোসরের মতো নাস্তিকতা পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় হয় যাবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এমতাবস্থায় সারা বিশ্বে নাস্তিকতার প্রচার প্রসার করার দায়িত্ব আমাদের উপরই বর্তায়। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা সবাই কি প্রস্তুত আছি?

উপস্থিত সবাই হাত তুললো। কেউ আবার দুটি হাতই উত্তোলন করলো। তাদের অতি উৎসাহ দেখে দাদাজানও বেজায় খুশি হলেন। চেয়ারের হাতলের উপর কিল মেরে বললেন,

- তাহলে আর ঘরে বসে থেকো না। এখনই বের হয়ে পড়ো। চাষা-ভূসা থেকে শুরু করে, নেতা-গোতা, মোল্লা-মৌলবী সবার কাছে দা'ওয়াত পৌঁছে দাও। যদি কেউ একজনকে নাস্তিকতায় ডেকে আনতে পারে তবে তাকে এক হাজার টাকা সম্মানী প্রদান করা হবে। নবাগত নাস্তিককেও এক হাজার টাকা প্রদান করা হবে। তা ছাড়া তাকে নাপাক কমিটির সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে মাসিক

ভাতা প্রদান করা হবে।

এভাবেই তিনি এই দা'ওয়াতী কাজের পুরস্কার ঘোষণা করেন। এ ছাড়া তিনি আর কিই বা করতে পারেন। হুজুরদের মতো তিনি তো আর আল্লাহ-আখিরাতে বিশ্বাস করেন না। তাই সস্তা সওয়াবের কথাও ঘোষণা করতে পারছেন না। অগত্যা তাকে প্রতিটি কাজের বিনিময়ে কাড়ি কাড়ি টাকা-পয়সা ঢালতে হয়। কি আর করা!

হাজার টাকা পুরস্কারের কথা শুনে নাপাক কমিটির সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক হৈ হুল্লোড় পড়ে গেলো। শিমুলতো আক্ষেপ করে বলে উঠলো,

- ইস! আগে জানলে ঐ জমজ হুজুর দুটো দিয়ে দা'ওয়াতী কাজ শুরু করতাম।

তারপর রিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলে,

- তুই কি ওদের ঠিকানা নিয়েছিস?

রিয়াদ মাথা নাড়ে। ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার কথা তার মাথাতেই আসেনি। শিমুল তবে মোটেও হতাশ হয় না। চোঁঠ উন্টিয়ে বলে,

- ও আমি জোগাড় করে নেবো। রেল স্টেশনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেই হলো।

রিয়াদ কিছুতেই বুঝতে পারে না ঐ দুই জমজ হুজুর নিয়ে শিমুলের এতো চিন্তা কেনো। জগতে কি দা'ওয়াত দেওয়ার মতো আর কোনো হুজুর নেই!

তিন.

সেদিনের মিটিংয়ের পর থেকে ক্ষুদে নাস্তিকগণ বেশ তৎপর হয়ে উঠলো। তারা ওলিতে গলিতে ঘুরাঘুরি করতো আর সুযোগ পেলেই এর ওর সাথে স্রষ্টা ও সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতো। এতে ফলাফল হলো অত্যন্ত মারাত্মক। এ দেশের মানুষ ধর্মভীরু না হলেও ধর্মপ্রাণ মুসলমান। পথে ঘাটে নাস্তিকতার প্রচার প্রসার তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নাস্তিকতার প্রচার প্রসারে তাই খুব একটা সাড়া পাওয়া যায় না।

এতকিছুর মধ্যে মীরার অভিযান কিছুটা সফল হয়েছিলো। সে কোথা থেকে এক বান্ধবী জুটিয়েছিলো নাপাক কমিটিতে যোগ দেবার জন্য। তাকে সে ঠিক কি দা'ওয়াত দিয়েছিলো বলা মুশকিল তবে দেখা যেতো

দাদুর কাছে এসে সে মাসিক ভাতা আর অন্যান্য সুবিধা ছাড়া ভিন্ন কোনো বিষয়ে কথাই বলতো না। কি কি কাজে মাসিক ভাতা বাড়ে এবং সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ত মাসিক ভাতা প্রদান করা হয় সেসব ব্যাপারে প্রশ্ন করে দাদাকে খুব বিরক্ত করতো। শেষে তো এমন একটা কাজ করলো যা নাপাক কমিটির ইতিহাসে কখনও ঘটেনি। একদিন সে দাদার কাছে ছয় মাসের টাকা অগ্রীম চেয়ে বসলো। দাদা প্রথমে দিতে রাজি হলেন না কিন্তু অধিক পীড়া-পীড়িতে না দিয়ে পারলেন না। মাসিক দুই হাজার করে ছয় মাসে মোট বারো হাজার টাকা তাকে প্রদান করলেন। তার পর থেকে সেই মেয়েটা লাপান্তা হয়ে গেলো। এখনও মাঝে মাঝে মীরার সাথে দেখা হলে সে নাকি হেসে বলে,

- তোর নানা নিজেকে বিরাট বুদ্ধিমান ভাবে কিন্তু লোকটা তো দেখলাম নিরেট বোকা।

মীরা তাকে বলেছে,

- তুই আমাদের ফাঁকি দিয়েছিস। তোর কপালে কষ্ট আছে।

মেয়েটা হেসে বলে,

- জান্নাত-জাহান্নাম যখন নেই তখন কষ্ট আবার কিসের?

এই যুক্তিটা মীরার মাথায়ও চক্রর খেলে যায়।

- তাই তো। নানাজানের সার্বিক দেখভাল সেই করে।

তাই তার সিন্দুকের চাবি থেকে শুরু করে যাবতীয় গোপন সম্পদের খোঁজ তার কাছে আছে। এতদিন নৈতিকতার খাতিরে সে কোন অনিয়ম করেনি। এই মেয়েটা তার চোখ খুলে দিয়েছে। হাশর-নাশর বলে যখন কিছু নেই তখন নানাজানের সিন্দুক ফাঁকা করে দিয়ে সব সম্পদ লুটে নিলেই বা কি যায় আসে?

এর পর থেকে দেখা যেতো ভাতা কর্তিত হলেও মীরা কোনো পরওয়া করতো না।

শিমুল একটা অন্যরকম ফাঁকিবাজী করেছিলো। রাস্তায় এক মোল্লাকে দাঁড় করিয়ে বলেছিলো,

- হুজুর মিলাদ পড়াবেন?

হুজুর তো পুরা ভেবাচেকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। শিমুল আবার বললো,

- ভাবছেন কি? পুরা পাঁচশ টাকা দেবো।

হুজুর তখন টাকার লোভে রাজি হয়ে গেলো। শিমুল তাকে সাথে করে সোজা চলে গেলো দাদাজানের কাছে।
গিয়েই বলল,

- দাদাজান, এই লোকটাকে আমি দা'ওয়াত করে এনেছি।

দাদাজান হুজুরের দিকে তাকিয়ে কর্কষ গলায় বললেন,

- এ আপনাকে দা'ওয়াত দিয়েছে?

হুজুর মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ সূচক সম্মতি জানালো আর নাক নিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে মজাদার কোনো খাবারের অস্তিত্ব আছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করলো।
শেষে হতাশ হয়ে বলল,

- খানা-পিনার আয়োজন নেই বুঝি? কেবলই টাকা!

শিমুল ফিস ফিস করে বলল,

- আ হা! ব্যস্ত হচ্ছেন কেনো? পাশেই হোটেল সেখান থেকে খাবার-দাবার নিয়ে এসে তবারোকের ব্যবস্থা করা হবে। এখন কেবল দাদাজানের কথায় সাই দিয়ে যান।

এই কথায় আশ্বস্ত হয়ে হুজুর দাদাজানের দিকে
তাকালেন। দাদাজান মোটা গলায় বললেন,

- নাস্তিকতা কাকে বলে জানেন?

হুজুর তড়িঘড়ি করে বললেন,

- আলবাত জানি। যারা আল্লাহ-রাসুল কিছুই চেনে না,
কুরআন-হাদীস কিছুই মানে না। তারাই নাস্তিক।

মোট কথা, সে তড়িঘড়ি করে যা বলল, তাতে তার
কথাটা দাদাজানের কবিতার কান ঘেসে চলে গেলো।
তাতেই দাদাজান খুশি হয়ে বললেন,

- একে এক হাজার টাকা পুরস্কার দাও।

হুজুর অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন,

- আর খাওন-দাওন?

দাদা বিরক্ত হয়ে বললেন,

- তুমি কদিন ধরে ভুখা আছো বাপু! এসে পর্যন্ত কেবল
খাই খাই করছো। এই শিমূল, যা তো লোকটাকে হোটেল
থেকে বিরিয়ানী খাইয়ে আন।

মিলাদের আগেই টাকা-কড়ি আর খাওয়া-দাওয়ার হিসাব
চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেখে হুজুর খুব খুশি হলেন।
দাদাজানের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- আল্লাহ ..

তিনি বলতে যাচ্ছিলেন আল্লাহ আপনার ভাল করবেন।
কিন্তু শিমুল তার মুখে হাত চেপে ধরে দাদার দিকে
তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল,

- মানুষ অভ্যাসের দাস।

দাদাও মুচকি হেসে সম্মতি জানালেন। তিনিও বিষয়টা
বোঝেন। প্রথম প্রথম যখন নাস্তিক হয়েছিলেন তখন
মাঝে মাঝে বলতেন,

- আমার মেয়েটা অসুস্থ, তার জন্য দোয়া করবেন।

তার কোনো এক বন্ধু একবার টিটকারী করে বলেছিলো,

- তা দোয়াটা কার কাছে করবো? তুমি তো আবার
স্রষ্টাকে বিশ্বাসই করো না।

একথাই তিনি প্রথমে বন্ধুর উপর ভীষণ চটেছিলেন।
বলেছিলেন,

- একটা মা'ছুম বাচ্চা অসুস্থ আর তুমি এই নিয়ে ঠাট্টা করছো?

পরে তিনি ভেবে দেখলেন কথা তো ঠিক। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। ভুল করে আল্লাহ রসুলের নামও যেমন মুখে উচ্চারণ করেন না। কারো কাছে দোয়াও প্রার্থনা করেন না।

দাদার নির্দেশে মীরা হুজুরের হাতে এক হাজার টাকা প্রদান করলো আর শিমুল তাকে নিয়ে গেলো পান্না ভাইয়ের রান্না করা মজাদার বিরিয়ানী খাওয়াতে। যার এক প্লেটের দামই তিনশ টাকা। হুজুর খেলেনও খুব। তার একার বিলই দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেলো। শিমুলও সুযোগ বুঝে কিছু সাটিয়ে নিলো। তাতে তাদের খাওন বাবদ দাদাজানের হাজার দুয়েকের কিছু বেশি টাকা খরচা হয়ে গেলো।

এরপর তারা ফিরে এলে, দাদা চিৎকার করে বললেন,
- এই কে আছিস লোকটাকে নাপাক কমিটিতে ভর্তি করে নে।

নাপাক কমিটিতে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে হুজুর যেনো

আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি এসেছেন মীলাদ পড়াতে,
কোথাও ভর্তি টর্তি তো হওয়ার কথা না। বিশেষ করে
তিনি হুজুর মানুষ হয়ে নাপাক কমিটিতে ভর্তি হতে
যাবেন কোন দুঃখে! তিনি আপত্তি করে বললেন,

- না, না। মশাই আমি এই মাত্র পাক-ছাপ হয়ে বাড়ি
থেকে বের হয়েছি নাপাক হওয়ার কোনোই ইচ্ছা নেই
আমার।

দাদা হুংকার ছেড়ে বললেন,

- কিন্তু নগদ এক হাজার টাকা পকেটে আর চার-পাঁচ
প্লেট বিরিয়ানী যে পেটে ভরলেন সেটা শোধ করতে হলে
তো নাপাক কমিটিতে আপনাকে ভর্তি হতেই হবে।

হুজুর এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন,

- দোহাই আপনার। এই নিন আপনার টাকা আমি
আপনাকে ফেরত দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দিন।

দাদা জমিদারী কায়দায় ধমক দিয়ে বললেন,

- আর বিরিয়ানী।

হুজুর এবার পুরা লা জবাব হয়ে গেলেন। কথায় বলে

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। তার চিরাচরিত খাই খাইয়ের
জেরেই আজ তার এই দশা। আমতা আমতা করে
বললেন,

- আমাকে ছেড়ে দিন। বাড়ি ফিরে আমি আপনার টাকা
শোধ করে দেবো।

দাদা বললেন,

- নরম কথায় চিড়া ভিজবে না। টাকা শোধ করে তাই
এখান থেকে বাড়ি যেতে হবে।

হুজুর বিশাল ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ মন মরা
হয়ে বসে থাকলেন। তারপর হঠাৎ তার মুখটা খুশিতে
চকচক করে উঠলো। পকেট থেকে একটা মোবাইল আর
একটা ময়লা নোট বুক বের করলেন। নোটবুক থেকে
খুঁজে খুঁজে একটা নাম্বার মোবাইলে ভরে কল করলেন।

- মিয়া সাহেব? কেমন আছেন?

ওপাস থেকে কেউ একজন কিছু একটা বলল। তারপর
হুজুর বললেন,

- ভাবছি, আজ মাদ্রাসায় আপনার বাবার নামে একটা

মীলাদ শরীফ পাঠ করবো।

ওপাসের লোকটা সম্ভবত সম্মতি জানালো। কারণ দেখা গেলো হুজুরের মুখটা খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো। ওপাশ থেকে হয়তো মিলাদের খরচপাতির কথা জিজ্ঞাসা করা হলো। তাই হুজুর বললেন,

- এই ধরেন হুজুরদের পকেট খরচ আর পোলাপানদের তাবারোক বাবাদ দেড় হাজার টাকা হলেই হবে। জী ... জী। আমি এখন এই ছেলে কোন জায়গা এটা?

শিমুলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতেই সে বলল,

- পাকড়া গাছি, মুজিবুল হকের বাড়ি।

ঠিকানাটা বলতেই ঐ পাশের লোকটা বোধ হয় দাদাজানকে চিনতে পারলো। হুজুর নাস্তিকের বাড়ি কি করছেন এমন একটা প্রশ্নও হয়তো করলো। হুজুর বললেন,

- তা নাস্তিকদের পথে আনতে হবে না? আল্লাহর রসুল দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে আবু জেহেলের বাড়ি কত বার গেছে না?

কথাটা বলে হি হি করে হেসে উঠলেন। ঐ পাশের লোকটা হয়তো এই রসিকতায় শরীক হলো না। তাই দেখা গেলো হুজুর নিজেই কিছুক্ষণ হেসে আবার মুখ গোমড়া করে ফেললেন। তবে মুখে খুশির ভাবটা থেকেই গেলো। অর্থাৎ টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

আধা ঘন্টার মধ্যে মটোর বাইক যোগে একটা আধা বয়স্ক লোক টাকা দিয়ে গেলো। চোখ কটমট করতে করতে হুজুর টাকাটা দাদার হাতে তুলে দিলেন। দাদা টাকাটা হাতে নিয়ে বলল,

- ঐ যে বললেন কার বাবার নামে মীলাদ পাঠ করবেন সেটার কি হবে?

হুজুর দৃঢ়ভাবে বললেন,

- সেটা আমি একাই পড়িয়ে দেবো। আমার একার দোয়া একশ লোকের দোয়ার সমান।

দাদা বললেন,

- পোলাপানদের তাবারোকের ব্যবস্থা কি হবে?

বিরক্ত কণ্ঠে হুজুর বলে,

- ওরা তো মাদ্রাসার লিল্লাহ বোডিং এ তিন বেলা খাওয়া-
দাওয়া করেই। নতুন করে তাবারোক খাওয়ানোর কোনো
দরকার আছে কি?

কথাটা বলেই হুজুর তড়িঘড়ি করে বের হয়ে যায়। হুজুর
বের হয়ে যাওয়ার পরই দাদা বলে ওঠেন,

- কেমন চালাকী দেখেছিস?

রিয়াদ এই কান্ড দেখে সত্যিই ভীষণ অবাক হলো। ধর্মের
দোহাই দিয়ে মোল্লারা দুনিয়া কামায় করে কথাটা দাদার
কাছে সে বহু বার শুনেছে। তবে বিষয়টা যে এতদূর
গড়িয়েছে তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা ঘটালো রিয়াদের চাচাতো ভাই
সোহেল। সে গিয়েছিলো এক এলাকায় নাস্তিকতার
দাওয়াত দিতে। গরমের ছুটি কাটানোর নাম করে
সেখানে এক বন্ধুর বাড়ি আস্তানা গেঁড়েছিলো সে। তার
কাজ ছিলো তারই মতো যুবকদের টার্গেট করে ভাব
জমিয়ে তোলা এবং পরবর্তীতে তাদের ক্রমে ক্রমে
নাস্তিকতার দিকে আকৃষ্ট করা। পরিকল্পনার প্রথম অংশ
খুব সহজেই বাস্তবায়িত হলো। দাদাজানের অটেল

সম্পত্তির যতটুকু মাসিক ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ হস্তগত করতো তারই একটা অংশ এলাকার যুবকদের মাঝে খরচ করাই তারা অল্পদিনের মধ্যেই তার ভক্তে পরিনত হলো। মাঝে খাওয়া-দাওয়া আর প্রসাব পায়খানার সময়টা কেবল বাদ দিয়ে সকাল ভোর থেকে শুরু করে, রাত্রি দুপুর পর্যন্ত জমিয়ে চলতো আড্ডা। বিড়ি-সিগারেট, পান-তামাক এর সাথে চলতো তাস খেলা। তাসের সাথে মাঝে মাঝে জুয়াও চলতো বটে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সোহেল তাদের শোনাতো নাস্তিকতার মহামন্ত্র। স্রষ্টা নাই, ধর্ম নাই, কুরআন কিতাব কিচ্ছু নাই। সঙ্গী-সাথীরা তখন মাদক আর জুয়ার নেশায় বিভোর হয়ে থাকতো। তারা তার কথা শুনতো কিনা তা বলা মুশকিল। তবে কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতো না। তাদের কাউকে কাউকে নাপাক কমিটিতে সদস্য হতে বললে, তারা অবাক হয়ে বলতো,

- এমনিতেই আমরা যথেষ্ট নাপাক। এর চেয়ে বেশি নাপাক হতে পারবো না।

এর চেয়ে বেশি পীড়াপিড়ি করলে তারা বলতো, তিন বেলা ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়া আর দিন রাত তাস খেলার

সুযোগ পেলে তারা যে কোনো কমিটিতে যোগ দিতে
 রাজি। কিন্তু সোহেল জানে নাপাক কমিটিতে যোগ দিলে
 কেবল তাস খেলা নয় বরং তার সাথে অনেক কাজও
 করতে হবে। শুধু শুধু একদল জুয়ারুকে তো আর
 দাদাজান ভাতা দিয়ে পুষবেন না। অতএব এত চেষ্টা-
 প্রচেষ্টার পরও নাপাক কমিটির কোনো সদস্য বৃদ্ধি করা
 গেলো না। তবে এদের সাথে বন্ধুত্ব করে এক দিক থেকে
 লাভ হলো। খারাপ সঙ্গে চলতে চলতে এলাকায় বেশ
 শক্ত অবস্থা গেড়ে বসে সোহেল। কেউ আর তার দিকে
 চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায় না। তখন মনে সাহস
 সঞ্চয় করে বন্ধু-বান্ধবদের বাইরেও কিছু দা'ওয়াতী কাজ
 করার চেষ্টা করে। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। যে বন্ধুর
 বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিলো, তারই দুঃসম্পর্কের মামার সাথে
 একবার কথা হয় তার। লোকটা পাঞ্জিগানা নামাজ
 আদায় করে না তবে শোকোরানা আদায় করে। মানে
 পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না বটে কিন্তু শুক্রবারে হাজিরা
 দেয়। গোন্ডা বদমাশদের বাইরে এই এলাকায় এর চেয়ে
 খারাপ লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাকীরা দিনের মধ্যে
 তিন-চার ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। তাই সোহেল তাকে
 দিয়েই শুরু করলো। প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কথা বলছিলো

সে। তাতে লোকটা মনে হলো বেশ আগ্রহী হয়ে শুনছে। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে যেই না বলেছে আল্লাহর অস্তিত্ব নেই, কুরআন-হাদীস কিছুই সত্য নয় অমনি ভীষণ রেগে উঠে লোকটা তার নাকে-মুখে কিল-ঘুসি মারতে আরম্ভ করলো। দিনের বেলায় সোহেলের চোখে রাতের তারা ভেসে উঠলো। তাকে ওভাবে মারতে দেখে এলাকার লোক জড়ো হয়ে গেলো গোটা বিশেক। তাদের মধ্যে দু চারজন দাঁড়ি-টুপি ওয়ালা লোকও ছিলো। সব শুনে তারাও সোহেলকে তুলোধোনা করতে থাকলো। ঠেকানোর মতো কোনো লোক পাওয়া গেলো না। সোহেলের বন্ধুরা আসে-পাশেই ছিলো। গণপিটুনির খবর শুনে তারাও কোন দিকে পালালো তা বলা মুশকিল। শেষে যেই লোকটি প্রথমে পিটুনি শুরু করেছিলো সেই বলল,

- আর মারবেন না। ব্যাটা বেয়াদব বদমাশ। শেষে মরে গেলে আমার নামেই আবার কেস টেস হয়ে যাবে। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেন না।

কথাটা বলে নিজের হাতটা মুষ্টি বদ্ধ অবস্থায় নাকের কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। মনে হলো,

এতক্ষণ ধরে যতটুকু মারধর করেছেন তাতে হাত গন্ধ হয়ে গেছে কিনা সেটা লক্ষ্য করছে। তার কথাই সবাই কার্যত বিরতি দিলেও এ নিয়ে আলোচনার কোনো ঘাটতি থাকলো না। যতটুকু পিটুনি দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয় বরং এরচে অনেক বেশি পিটুনি দরকার। পিঠের চামড়া তুলে ফেলা দরকার। গাছে ঝুলিয়ে রাখা দরকার ইত্যাদি নানা করম লোমহর্ষক মন্তব্য করতে লাগলো তারা। সেসব শুনে ঐ অবস্থায়ই আধমরা শেয়ালের মতো নিজেকে টানতে টানতে সোহেল বন্ধুর বাড়ি গিয়ে উঠলো। বন্ধুকে কিছুই বলতে হলো না। সে সবই শুনেছে। তাকে দেখেই তার মুখটা শুকিয়ে গেলো। বোধ হয় গণপিটুনি তাকেও খেতে হয় কিনা সেই ভয়ে সে শিটকে গেছে। মুখ ফ্যাকাসে করে বলল,

- তুই বাড়ি চলে যা।

সোহেল খুব করুণভাবে বলল,

- এ অবস্থায় কিভাবে যাবো। একটু সুস্থ হয়ে নিই। কাল-পরশু চলে যাবো।

- এর মধ্যে যদি আবার তোকে মারতে আসে।

- মারতে আসবে বললেই হলো? আমরা আছি না!

কথাটা বলতে বলতে গোন্ডা বদমাশদেরই কয়েকজন সেই বাড়িতে প্রবেশ করলো। তাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভীষণ রাগ হলো সোহেলের। গণপিটুনির সময় এরা আসেপাশেই ছিলো। তৎক্ষণাৎ কোথাও গা ঢাকা দিয়েছিলো। বিরক্ত কণ্ঠে সোহেল বলল,

- তোমরা আর কি করবে? তোমাদের মুরদ তো তখন দেখলামই।

তাদেরই একজন ঠান্ডা মেজাজে বলল,

- তুমি তো দেখি রাজনীতির কিছু বোঝো না। গণপিটুনিকে বলা চলে ঝড়। সে তুমি ইংরেজীতে সুনামীও বলতে পারো, আবার বাংলায় কালবৈশাখী ঝড়ও বলতে পারো। ওর মাঝে কি আর মাস্তানী খাটে! তোমাকে ঠেকাতে গেলে আমাদেরই পিটিয়ে তেলপিঠে বানিয়ে ফেলতো। এখন আমরা অন্য রাজনীতি করবো। গায়ের মাতব্বরদের কাছে বিচার দেবো। দেশে একটা আইন-কানুন আছে না? মোড়ল মাতব্বররা সবাই আমার নিকট আত্মীয়। দেখবে ঐ বেটাকে লোক সম্মুখে ক্ষমা চাইয়ে

তাই ছাড়বো।

কথাটা শুনে সোহেলের বেশ ভাল লাগলো। কমপক্ষে এতটুকু হলেও তার মানটা বাঁচে। কথা অনুযায়ী কাজ হলো। মোড়ল-মাতব্বরদের কাছে বিচার দেওয়া হলো। এশার নামাজের পর কাচারি ঘরে বিচার বসলো। কয়েকশ লোক এসে সেখানে ভিড় জমালো। মোড়ল-মাতব্বররা আসলো। আসে-পাশের কয়েকটা মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনরা আসলো। এমনকি থানার ওসি পর্যন্ত কয়েকজন সিপাই নিয়ে হাজির হলো। সোহেল ভাবলো এতো লোকের মাঝে যদি লোকটা আমার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় তবে কতই না ভালো হয়! কিন্তু গন্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ হাজির হওয়ার সাথে সাথেই জনগণ স্লোগান দিতে লাগলো,

নাস্তিকের চামড়া - তুলে নেবো আমরা

বিচার চাই, বিচার চাই - নাস্তিকের বিচার চাই

তখন আরো একটা বৃহত্তর গনপিটুনির আশঙ্কায় সোহেলের দেহটা শিউরে উঠলো। জনগণের ইচ্ছানুপাতেই রায় হলো। ঠিক করা হলো, সোহেল কান

ধরে পঞ্চাশবার উঠা বসা করবে এবং সবার নিকট কড়োজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। জনসমুদ্র থেকে করতালির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হলো। বাধ্য হয়ে সোহেলকে এই শাস্তি মেনে নিতে হলো। সকালের পিটুনির পর ব্যাথাটা এখনও শরীরে রয়েছে। সেই শরীর নিয়ে তাকে উঠা-বসা করতে হলো। পঞ্চাশবার পূর্ণ হলো না। শেষে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেলো। তার এই অবস্থা দেখে কেউ সমবেদনা জানানো না। উল্টো সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

পর দিন সকালেই সোহেল পাত-তাড়ি গুছিয়ে নিয়ে দাদুর কাছে ফিরে এলো। সব শুনে দাদু যতটা না সোহেলের জন্য ব্যাখিত হলেন তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হলেন তার সাধের নাস্তিকতার দুর্দিনের কথা ভেবে। আক্ষেপ করে বললেন,

- তবে কি কিছুতেই নাস্তিকতাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না?

তারপর তার মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠলো তিনি গেয়ে উঠলেন,

ঝরলে ঝরুক দেহের রক্ত

নাস্তিকতায় থাকবো লিপ্ত

তার এই কবিতা সেদিন সোহেলের ভাল লেগেছিলো
কিনা তা বলা মুশকিল। তবে রিয়াদ মুখ টিপে টিপে
কেবলই হেসেছিলো। শেষে দাদু হুংকার ছেড়ে বললেন,

- আমি সুদে আসলে এর শোধ নেবো। জমিদার বংশের
গায়ে হাত তোলা আমি বের করে দেবো।

রিয়াদ বা সোহেল উভয়ই বুঝতে পারে এসব কথা দাদুর
মুখের বুলি নয়। তিনি নিশ্চয় কিছু একটা করবেন। কিন্তু
ঠিক কি করবেন তা বোঝা যাচ্ছে না। জিজ্ঞাসা করেও
লাভ নেই। নিজের প্লান প্রোগ্রামের কথা পোলাপানদের
সাথে খুলে বলা তিনি পছন্দ করেন না। এক্ষেত্রে অবশ্য
ব্যতিক্রম হলো। রাতে সবার সামনেই তিনি তার এক
বন্ধুকে ফোন করলেন। বন্ধুটি পুলিশের উর্ধ্বতন
কর্মকর্তা। নাস্তিকমনা লোক। সব শুনে ব্যাথায় ককিয়ে
উঠলেন।

- আহা! তুমি কিনা প্রাক্তন জমিদার আর আজ তোমার
নাতির এই হাল!

কথাটা শুনে দাদা আবারও খেকিয়ে উঠলেন,

- ঐ ব্যাটারদের আমি রাঙা পানি খাইয়ে তবে ছাড়বো।

বন্ধুটি সমবেদনা জানিয়ে বলে,

- কি করতে চাও?

দাদা বললেন,

- সেটা তো তোমারই হাতে। তা না হলে তোমার কাছে কেনো ফোন দিয়েছি?

- ঠিক আছে তুমি চাইলে আমি আজই ঐ থানার ওসির কাছে ফোন করে বলছি সেদিন যাকে গনপিটুনি দেওয়া হয়েছে সে আমার নিকট আত্মীয়। বিচারে যেসব মোড়ল-মাতব্বর আর ইমাম মুয়াজ্জিন হাজির ছিলো তাদের যেনো আজই গারদে ভরা হয়। তা না হলে ঐ ওসিকে আমি আমাজান জঙ্গলে বদলী করে দেবো।

দাদা সন্তোষজনকভাবে হেসে বললেন,

- এভাবে কি আর যুতসই শাস্তি হবে ওদের। তুমি ফোন দিয়ে গারদে ভরে দেবে পরে ওদের আত্মীয়রা ফোন দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। শাস্তির কিছুই হবে না তাতে।

উল্টো কিছুদিন জেল খাটার কারণে হিরো বনে যাবে এই আর কি। এর চেয়েও কঠিন একটা শাস্তির কথা আমি ভেবে রেখেছি। ইতিহাসে যা আগে কখনও ঘটেনি।

এর চেয়ে কঠিন শাস্তি কি হতে পারে বন্ধুটি তা ভেবে উঠতে পারে না। তিনি জানেন মুজিবুল হক ছেলে খেলা করার মানুষ নয়। তাই উৎসাহী হয়ে বলেন সেটা কেমন?

- তুমি ফোন করে বলবে নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে বসতে হবে। তা না হলে, নেতা-গোতা আর ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ধরে ধরে গারদে ভরা হবে। মারপিটে যারা এতটা পটু তাদের পেটে কতুটুকু বিদ্যে আছে তাই একটু দেখতে চাই।

বন্ধুটি দারুণ খুশি হয়ে বলেন,

- ছজুরদের সাথে বিতর্ক করবে? ভেরি ইন্টারেস্টিং! ঠিক আছে দরকার হলে আমি নিজেই সেখানে হাজির থাকবো। এমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা স্বচক্ষে না দেখলে সারাটা জীবন আমাকে পচতাতে হবে।

- সে তোমার খুশি কিন্তু আগে যা বললাম তাই করো।

- আমার কাজ আমি করছি। তুমি কিন্তু বিতর্কের জন্য

ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রেখো।

দাদু মুচকি হেসে বলেন,

- তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফোন রেখে দিতেই নাপাক কমিটির সদস্যরা দাদুকে ঘিরে ধরলো। মীরা বলল,

- নানাজান এসবের কোনো দরকার নেই। ওরা হয়তো আপনাকেই গণপিটুনি দিয়ে দেবে। সোহেল ভাই যুবক মানুষ বলে অতটা মার খেয়েও বেঁচে ফিরে এসেছে। কিন্তু আপনি বুড়ো মানুষ অতো মার কি সহ্য করতে পারবেন!

দাদু এবার আগের চেয়েও বেশি রেগে গেলেন।

- গণপিটুনি দেবে আমাকে? কার এত বড় কলিজা যে খান সাহেবের ছেলে মুজিবুল হককে গণপিটুনি দেয়!

আর কারো কিছু বলার সাহস হলো না। ভয়ংকর একটা পরিণতির জন্য আতংকিত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সবাই। দাদু লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করে সময় কাটাতে লাগলেন।

কদিন পরে পুলিশ অফিসার বন্ধুটি ফোন করে জানিয়ে

দিলো,

- জেল খাটার ভয়ে মোল্লারা বিতর্কে বসতে রাজি হয়েছে। দেশের অন্যতম বড় মাদ্রাসা কলারোয়া দারুল উলুমের প্রধান মুফতি থাকবে ঐ পক্ষের আলোচক। অতিথি হিসেবে পীরে কামেল রহমত আলীও থাকবে। নাস্তিকদের পক্ষে আমি তোমার নাম বলে দিয়েছি। অঘোষিত অতিথি হিসেবে আমিও উপস্থিত থাকবো। আগামী শনিবার বেলা দশটায় আলোচনা শুরু হবে। তোমার বাহিনী নিয়ে যথা সময়ে হাজির হয়ে যেও।

রিয়াদের মনে একই সাথে আতংক ও আনন্দ উভয় প্রকার অনুভূতি খেলা করছিলো। বিতর্কে হেরে গেলে এই বুড়ো বয়সে দাদাজান হার্টফেল করে মারা যাবে কিনা তা নিয়ে যেমন একটা আশংকা রয়েছে। বিপরীতে বিতর্কে বিজয়ী হলে মোল্লারা রেগে মেগে শেষে গণপিটুনি দিয়েই তার ভব লীলা সাজ করে দেয় কিনা সেটা নিয়েও রয়েছে ঘোর তর সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত কি হবে সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই নেই।

চার.

বিতর্কের আগের দিন দাদাজান বেশ মজার একটা কাজ করলেন। কোথা থেকে একটা মোটা সোটা ছাগল কিনে আনলেন। রিয়াদ ভেবেছিলো বিতর্কের দিন কি হয় তার ঠিক নেই তাই হয়তো সবাইকে সাথে নিয়ে ভাল-মন্দ খেয়ে আর আমোদ-ফুটি করে আজকের দিনটা কাটাতে চান তিনি। কিন্তু দেখা গেলো তার ধারণা ভুল। রাতুলকে বললেন,

- ছাগলটা নিয়ে কলারোয়া দারুল উলুমে চলে যা। মাদ্রাসার মুফতি সাহেবকে খুঁজে বের করে তার হাতে দিয়ে বলবি, আমার মায়ের মানত ছিলো এতীম ছাত্রদের খাওয়ানো। তারপর সোজা বাড়ি চলে আসবি।

কান্ড দেখে সবার তো চোখ চড়ক গাছে উঠে গেলো। প্রতিপক্ষকে এমন সমাদর করার কারণ কি হতে পারে তা কারো মাথায় আসলো না। শিমুল ফিস ফিস করে বলল,

- ছাগলের শরীরে নিশ্চয় বিষ ঢুকানো আছে। মোল্লারা খেয়েই জাগায় ব্রেক।

রাতুল বলল,

- নানাজান বোধ হয় মোল্লাদের ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

সবার কানাকানি আর চোখাচোখি দাদাজানের দৃষ্টি এড়ালো না। তবে তিনি কিছুই বললেন না। কেবলই মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন।

ঘটনার দিন দাদাজান এক পাল নাতি-নাতনী নিয়ে যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হলেন। সোনাপুর থানার একটা হলরুমে বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিলো। প্রচুর সংখ্যক সাধারণ জনগণ তো ছিলোই সেই সাথে দেখা গেলো প্রচুর পরিমাণ পুলিশের সোর্স প্রহরায় রয়েছে। আসলে দাদাজানের বন্ধু সেই উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার আগেই হাজির হয়েছিলেন বলেই হয়তো এতো কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। মোল্লারা একটু দেরি করেই আসলো এবং এসেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে জরুরী অবস্থায় পাবলিক ক্ষেপিয়ে কিছু একটা গন্ডোগোল বাধিয়ে বিতর্ক বানচাল করার প্লানটি বাতিল হয়ে গেলো। সেই থেকে তাদের হাট একটু বেশি দ্রুত বিট দিতে লাগলো বলেই মনে হচ্ছিলো। একটি বিশাল

হলরুমে আলোচনার সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। দুই দিকে দুই পক্ষ বসার জন্য গদি চেয়ার আর সামনে দর্শক-শ্রোতাদের বসার স্থান। একজন পুলিশের লোক উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় তিনি বারংবার বিতর্কের নিয়মাবলীগুলো পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন।

- নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবো অন্য পক্ষকে গালি-গালাজ করবো না, ধৈর্য্য অবলম্বন করবো হৈ হট্টগোল করবো না

টেলিভিশনের খবরের মতো এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে চলেছিলো লোকটি। বিতর্কের যখন আর মিনিট দশেক বাকী তখন উপস্থাপক উভয় পক্ষের আলোচকদের আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন।

- কলারোয়া দারুল উলুমের প্রধান মুফতি আব্বাস শারীফত হোসেনকে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। বিপরীতে কমরেড মুজিবুল হককে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। সেই সাথে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং দর্শক-শ্রোতাদের অনুরোধ করছি নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসার জন্য

দাদাজান খপ করে রিয়াদের হাত ধরে বললেন,

- রিয়াদ বাবু আমাকে মঞ্চ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো।

রিয়াদ দাদার হাত ধরে ধীরে ধীরে হেটে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর দাদাজানকে গদি চেয়ারটিতে বসিয়ে মাথা তুলে তাকাতেই দেখলো ঐ প্রান্তের মুফতি সাহেবকে তারই বয়সের এক যুবক গদি চেয়ারে বসিয়ে দিচ্ছে। সে মাথা তুলে তাকাতেই রিয়াদ চমকে উঠলো।

- আরে! এ এতো আতিক। তারপর অনেক চেষ্টা করলো এই ছেলেটা ছোট আতিক নাকি বড় আতিক সেটা শনাক্ত করার। কিন্তু কিছুতেই সে স্থির করতে পারলো না। আলোচকরা আসনে উপবিষ্ট হতেই পুলিশের লোকেরা রিয়াদকে এবং রিয়াদের বয়সের সেই ছেলেটিকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে ইঙ্গিত করলো। নেমে যাওয়ার সময় রিয়াদ ইচ্ছা করেই আতিকের পাশ ঘেসে গেলো। ফিস ফিস করে বলল,

- আমাকে চিনতে পেরেছেন?

ছেলেটা অত্যন্ত শীতল গলায় বলল,

- হু।

- আরে এভাবে কথা বলছেন কেনো?

- নাস্তিকদের সাথে এভাবেই কথা বলতে হয়।

তারপর রিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলে,

- পিঠে ছালা বেধে এসেছেন নিশ্চয়?

কথাটা বুঝতে রিয়াদের বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে।
প্রথমে নিজের পিঠের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেই
তারপর কথার অর্থ বুঝতে পেরে বলে,

- কেনো মারবেন নাকি?

মুচকি হেসে ছেলেটা বলে,

- মার তো হবেই তবে হাতে নয় যুক্তিতে। ইনি হলেন
আমার উস্তাদ। আল্লাহর ওলী। প্রচন্ড জ্ঞানী ব্যক্তি। বিতর্ক
শুরু হলেই বুঝবেন কত ধানে কত চাল।

রিয়াদ বোকার মতো ভাব করে বলে,

- তাই বুঝি!

এরপর আর আলোচনা এগোনো গেলো না। উপস্থাপক
ঘোষণা করলেন,

- বিতর্কের সময় শুরু হয়ে গেছে। প্রথমেই কথা বলবেন, আল্লামা শারায়ত হোসেন।

আল্লামা কথা শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রথম অস্ত্রটি প্রয়োগ করলেন, মুজিবুল হকের দিকে ইশারা করে বললেন,

- আপনি কি আরবী জানেন?

মুজিবুল হোক এমন একটা প্রশ্নের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। পাঁচাশি বছরের অভিজ্ঞতায় বহু মোল্লার সাথে তিনি কথা বলেছেন। তাদের এই ঘোড়া রোগ সম্পর্কে তিনি তাই পূর্বপ্রস্তুতিও গ্রহণ করেছেন। কিছু আরবী তিনি মুখস্থ করে নিয়েছেন বিশেষ করে আঞ্চলিক কিছু আরবী। ব্রিটিশদের সময় তার বাবা শখ করে তাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়েছিলো। সেই সুবাদে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে যাতায়াত হয়েছে তার। সেখান থেকেই এমন কিছু আঞ্চলিক আরবীও রপ্ত করেছেন এদেশের মোল্লাদের পক্ষে যার মর্ম উদ্ধার করাই সম্ভব নয়। একটু হেসে তাই তিনি বললেন,

- তা জানি বৈকি। এমন কিছু আরবীও জানি যা আপনি নিজেও জানেন না।

মুফতি সাহেব হাসলেন। একজন নাস্তিকের মুখে এমন উদ্ভট কথা শুনে তার হাসাই উচিৎ। তাকে হাসতে দেখে মুজিবুল হক বলেন,

- এই যেমন ধরুন আমি যদি আপনাকে বলি, “ইনতা বেআক্কেল”। তবে আপনি কি বুঝবেন?

মুফতি সাহেবের মাথাটা প্রথমে আওলিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ ঘাটাঘাটি করে কথাটার অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। তারপর যখন অর্থটা বুঝতে পারলেন তখন ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন,

- ভরা মজলিসে আপনি আমাকে বেআক্কেল বলে গালি দিচ্ছেন?

মুজিবুল হক বেশ কৌতুক অনুভব করলেন। মাথা নেড়ে বললেন,

- না, না। মোটেও তা নয়। আমি আসলে বলতে চাচ্ছি আপনি কি খাবেন? মধ্যপ্রাচ্যে এই কথাটা আমি হরহামেশায় বলতে শুনেছি।

দর্শকদের মধ্যেও দু'একজন লোক ছিলো যারা পূর্বে
বিভিন্ন আরবদেশে প্রবাসী ছিলো। তারাও চিৎকার করে
বলল,

- আমরাও শুনেছি।

মুফতি সাহেব বুঝতে পারেন, বিতর্কের এই মোক্ষম
অঙ্কটি বিফল হয়েছে। কেবল বিফল হয়েছে তাই নয়
উল্টো তারই দিকে ফিরে এসেছে। অতএব এই লাইনে
বেশিদূর এগোনো যাবে না। তিনি এবার ভিন্ন লাইনে
কথা শুরু করলেন,

- নাস্তিকতা অতি ভয়ংকর একটি মতবাদ। এর পাপ
হিমালয় পাহাড় সমান। নাস্তিকদের সাথে আলোচনায়
বসাও একটা পাপ। এমনকি আমি যে আজ এই
মজলিসে এসেছি তাতেও হয়তো মহাপাপ হচ্ছে।
আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

এরপর তিনি আরবী শব্দ মুলহিদ, যিনদীক ইত্যাদি শব্দ
প্রয়োগ করে নাস্তিকদের গালি-গালাজ করলেন। অন্য
কোন কোন বুয়ুর্গ নাস্তিকদের কি কি ভাষায় গালিগালাজ
করেছেন সেটাও উল্লেখ করতে থাকলেন। এভাবে তার

সময়টুকু পার হয়ে গেলো। তার আলোচনার মধ্যে না দলীল সম্মতভাবে নাস্তিকদের কোনো যুক্তিকে খন্ডায়ন করা হলো আর না তাদের কোনো দাবী বাতিল প্রমাণিত হলো। পরবর্তীতে কমরেড মুজিবুল হক কথা বলার সুযোগ পেলেন। শুরুতেই তিনি বললেন,

- ধর্ম বলতে আমরা বুঝি নীতি বা নৈতিকতার শিক্ষা। আমরা জানি জাহেলী যুগে অনেক জুলুম ও অন্যায় অবিচার ছিলো। কারণ তারা ছিলো বেধর্মী। তারা অকারণে খুনোখুনি হানাহানিতে লিপ্ত হতো, কন্যা সন্তান মাটিতে দাফন করতো। অসমতা ও অসভ্যতা ছিলো তখনকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মানুষে মানুষে বৈষম্য, নারী পুরুষে বৈষম্য, মারা-মারি, খুনোখুনি, যুদ্ধ-সন্ত্রাস ইত্যাদি কাজে তারা লিপ্ত থাকতো। কারণ তাদের কোনো ধর্ম ছিলো না। তারা ছিলো বেধর্মী। পরে মহান আল্লাহ তার রসুলের উপর কুরআন অবতীর্ণ করে মানুষকে ইসলাম ধর্মের দীক্ষা দিলেন। যুদ্ধ, সন্ত্রাস ও খুনো-খুনির বদলে শান্তিই এই ধর্মের মূলমন্ত্র। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ভাই ভাই হয়ে মিলেমিশে সমাজে বসবাস করাটাই এর মূল ভিত্তি।

কোনোরূপ লিঙ্গ বৈষম্য না করে নারী-পুরুষের সমতায়ন ও ক্ষমতায়ন ইসলামের মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি। এসব কারণেই জাহেলী যুগের সাথে ইসলামী যুগের এতো পার্থক্য। আমি মুফতি সাহেবকে প্রশ্ন করি এসব কথা কি সঠিক?

মুফতি সাহেব কালবিলম্ব না করে এক গাল হেসে উঠলেন। বিতর্কটা তার কাছে এখন পান্তাভাতের মতোই মনে হচ্ছে। যে নাস্তিক ইসলামের এমন ভূয়সী প্রসংশা করছে তার ব্যাপারে আতংকিত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে তার মনে হচ্ছে না।

কমরেড মুজিবুল হক ছাড়ার পাত্র নন। বিনীতভাবে বললেন,

- দয়া করতে উত্তর দিলে আমি কৃতার্থ হবো। এসব কি সঠিক কথা?

মুফতি সাহেব কালবিলম্ব না করে বলে উঠলেন,

- নিশ্চয়, নিশ্চয়।

উপস্থিত জনতাও আনন্দে উল্লাসের শব্দ করে উঠলো। তারা ভাবলো বিতর্কের শুরুতেই যখন নাস্তিকটা

ইসলামের মহত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে তখন আজ হয়তো লোক সম্মুখে তওবা করেই বিদায় নেবে। কিন্তু তখনই মুজিবুল হোক নিজের মুখোস উন্মোচন করলেন,

- কিন্তু ধরুন আমি আজ প্রমাণ করে দিলাম ইসলাম উপরে যেমন বলা হলো আসলে তেমন নয় তাহলে কেমন হবে? তখন কি ইসলামকে সত্য ধর্ম বলা যাবে?

কথাটা শুনেই মুফতি সাহেবের বুকের ভিতরটা যেনো ছেৎ করে উঠলো। আমতা আমতা করে তিনি বললেন,

- তেমন নয় মানে কেমন নয়?

মুজিবুল হক হালকা হেসে বললেন,

- মনে করুন আমি প্রমাণ করে দিলাম, ইসলাম শান্তির ধর্ম নয় বরং সন্ত্রাসের ধর্ম, আগ বাড়িয়ে কাফিরদের উপর আক্রমণ করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েই পূর্ব যুগের মুসলমানরা রুটি রুজির ব্যবস্থা করেছে। আজও সত্যিকার মুসলিমরা তাই করে থাকে। মানুষে মানুষে সমতা সৃষ্টি করে মিলেমিশে একই সমাজে বসবাস করা নয় উল্টো কাফির ও মুমিনে বিস্তর ব্যবধান তৈরী করে বৈষম্যের সৃষ্টি করাই ইসলামের উদ্দেশ্যে। সেই সাথে

নারী ও পুরুষের মাঝে মান ও মর্যাদায় পার্থক্য ঘটানোই ইসলামের নীতি। যদি এসব আমি প্রমাণ করতে পারি তবে কি আপনি মেনে নেবেন ইসলাম সত্য ধর্ম নয়?

মুফতি সাহেব অবলিলায় বলে উঠলেন,

- অবশ্যই মেনে নেবো। এসব যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন তবে আমি নির্দিধায় মেনে নেবো যে আমি ভুল আর আপনিই ঠিক।

মুজিবুল হক উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, কথাটা সবাই মনে রাখবেন। তারপর তিনি আবারো আলোচনা শুরু করলেন,

- প্রথমেই সম্ভ্রাসবাদ প্রসঙ্গে কথা বলি। একজন কাফির কেবল কাফির হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা কি বৈধ?

মুফতি সাহেব কথার প্যাঁচ দেওয়ার চেষ্টা করেন,

- দেখুন সে যদি আমাকে হত্যা করতে আসে, আমার উপর আক্রমণ করে ...

তাকে বাধা দিয়ে মুজিবুল হক বলেন,

- আমি কিন্তু এসব বলিনি। সে আপনাকে আক্রমণ

করেনি। কেবল কুফরী করেছে। ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গেছে।

- না, না। এটা কখনও বৈধ নয়। এটা সন্ত্রাসবাদ।

মুজিবুল হক এক গাল হেসে বললেন,

- কিন্তু সহীহ বুখারীর জিহাদ অধ্যায়ে এসেছে, “যে ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে যায় তাকে হত্যা করো।”

মুফতি সাহেব অট্টহাস্য করে বললেন,

- এটা তো মুরতাদ।

মুজিবুল হক ধমক দিয়ে বললেন,

- মুরতাদ মানে তো আর গরু ছাগল নয় বরং সেও একটা মানুষ। তার অপরাধ কেবল এই যে, মুসলিম হওয়ার পর আবার কাফের হয়ে গেছে। আর এই হাদীস অনুযায়ী তাকে হত্যা করতে হবে। নাকি ভুল বললাম?

মুফতি সাহেব আর কিছুই বলতে পারেন না। লোকটা নাস্তিক হতে পারে কিন্তু তার কথা এক বিন্দু ভুল নয়। কিভাবে যে তিনি এখন মান সম্মানটা রক্ষা করবেন তাই বুঝতে পারেন না। শেষে একটা গোজামিল দেওয়ার চেষ্টা

করেন। আমতা আমতা করে বলেন,

- দেখুন দ্বীন ত্যাগ করলেই কাউকে হত্যা করা যায় না যদি না সে আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

মুজিবুল হোক উচ্চস্বরে হেসে বললেন,

- একথা আপনি ছাড়া অন্য কোন বড় আলেম বলেছে কি? এমন একজন আলেমের নাম বলুন। আমাকে ভুল বোঝানো সহজ কিন্তু এখানে আপনার অনেক ছাত্র আছে তাদের অনেকেই হয়তো আরবী ভাষা অত্যন্ত ভালো বোঝে। আমি তাদের অনুরোধ করবো, আপনারা কিতাব খুলে দেখবেন তো হুজুর যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেটা সঠিক নাকি আমার ব্যাখ্যাটা সঠিক। কেবল ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে যাওয়ার কারণেই মুরতাদকে হত্যা করা হয় নাকি এর জন্য মুরতাদের পক্ষ থেকে আক্রমণ সংঘটিত হওয়া শর্ত।

হুজুর বুঝতে পারেন তার গোমোড় ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

- দেখুন মুরতাদের প্রসঙ্গ ছাড়ুন। জন্মগত কাফিরদের কথা বলুন। তারা নিজেরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ

না করলে তাদের উপর তো আর আগে আক্রমণ করা হয় না।

দাদাজান রেগে গেলেন,

- মুরতাদের কথা ছেড়ে দেবো কেনো? সে কি মানুষ নয়? মানুষ হিসেবে যখন যে কোন ধর্ম বা মত গ্রহণ করার স্বাধীনতা কি তার নেই?

মুফতি সাহেব ভেবাচেকা খেয়ে বললেন,

- তাই তো থাকা উচিত।

- তাহলে ইসলাম তাকে সেই সুযোগ কেনো দিচ্ছে না? অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলে তাকে সাদরে গ্রহণ করছে কিন্তু ইসলাম থেকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করলে তাকে হত্যা করার আদেশ দিচ্ছে এটা কি সমতা হলো নাকি অসমতা হলো?

মুফতি সাহেব কিছুই বলতে পারলেন না। কেবল মুখ গোমড়া করে বসে থাকলেন।

উপস্থিত নাপাক কমিটির সদস্যরা চিৎকার করে উঠলো,

- দাদাজান জিন্দাবাদ। মুজিবুল হক জিন্দাবাদ।

মুজিবুল হক তাদের দিকে কটমট করে তাকালেন। তখন তাদের মনে পড়ে গেলো জিন্দাবাদ শব্দটির সাথে ইসলামের গন্ধ লেগে থাকার কারণে নাপাক কমিটির সদস্যদের জন্য সেটা উচ্চারণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই তারা নিরব হয়ে গেলো।

প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পেরে মুজিবুল হক ব্যাপক উৎসাহ পেয়ে গেলেন। তিনি এবার আগ বাড়িয়ে আলোচনা করতে লাগলেন,

- এই যে আপনি বলছেন জন্মগত কাফিরদের ইসলাম মানতে বাধ্য করা হয় না। এটাও একটা মিথ্যা কথা। সূরা নামলে এসেছে, নবী সুলাইমান রানী বিলকিস এবং তার এলাকার লোকদের বলেছিলো, মুসলিম না হলে তোমাদের উপর আক্রমণ করা হবে এবং তোমাদের এলাকা থেকে তোমাদের বের করে দেওয়া হবে। পরে রানী বিলকিস মুসলিম হয়ে তাই রক্ষা পায়।

মুফতি সাহেব এতক্ষণে কিছু বলার সুযোগ পেলেন।

- দেখুন এটা আগের শরীয়ত। আমাদের জন্য কেবল শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এর শরীয়ত মানা আবশ্যিক অন্য

নবীর শরীয়ত নয়। এটা আপনার জানা নাও থাকতে পারে।

মুজিবুল হক বললেন,

- কিন্তু সহীহ বুখারীর ঈমান অধ্যায়ে এসেছে, হজরত মুহাম্মদ ﷺ নিজেই বলেছেন, “আমাকে আদেশ করা হয়েছে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ না তারা কালেমা বলে মুসলিম হয়ে যায়।” সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতে জিজিয়া আদায় না করা পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা কি?

হাদীস-কুরআন যারা বাংলায় অনুবাদ করে বাজারে ছেড়েছে তাদের উপর মনে মনে ভীষণ ক্ষেপে ওঠেন তিনি। কিন্তু মুখে এসব রাগ প্রকাশ করেন না। কেবল বলেন,

- এ বিধান মানসুখ হয়ে গেছে।

মুজিবুল হক এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,

- ইয়ারমুক, কাদেসিয়া ইত্যাদি যুদ্ধের নাম শুনেছেন?

এসব কিন্তু রসুলের ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগে সংঘটিত হয়।

এ কাহিনী মুফতি সাহেবের জানা আছে। কিন্তু এর সাথে এই আলোচনার কি সম্পর্ক তা তিনি ধরতে পারেন না। মুজিবুল হক তখন বুঝিয়ে বলেন,

- দেখুন ইবনে কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া তে লেখেন, কাদেসীয়ার যুদ্ধে পারস্যের সেনাপতি রুস্তম মোটেও যুদ্ধ করতে চান নি উল্টো কিছু হাদীয়া দিয়ে মুসলিম বাহিনীকে দেশে ফিরে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু মুসলিমরা হয়তো ইসলাম গ্রহণ অথবা জিজিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে এই নীতির উপর অটল থেকে তাদের সাথে যুদ্ধ করেন এমনকি তাদের দেশ দখল করে নেন। এই ঘটনা খলীফা উমর এর খেলাফতকালে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। এই বিধান মানসুখ হলে খলীফা উমরই বা কেনো এর উপর আমল করলেন আর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসই বা কেনো যুদ্ধ করলেন।

ভুজুর এবার ইবনে কাছীরের উপরও রেগে গেলেন। কিন্তু সেই রাগ প্রকাশ করলেন মুজিবুল হকের উপর,

- আপনার মতো অধম লোকেরা এসব ঘটনার কি অর্থ বঝাবে?

মুজিবুল হোকও বাজখাই গলাই বললেন,

- তা মুরোদ থাকলে আপনি যে অর্থ বোঝেন সেটাই বলুন না জনগণ শুনুক।

উভয় পক্ষের দর্শকরাও কিছুটা হৈ চৈ করে উঠলো।

উপস্থাপক ঠান্ডা মেজাজে বললেন,

- দয়া করে উভয় পক্ষ শালীনতা বজায় রাখুন। এবারে আলোচনা পেশ করবেন, আল্লামা শারায়ত হোসেন।

আলোচনা পেশ করার মতো মানসিকতা শারায়ত হোসেনের ছিলো না। ইতোমধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তাতেই তার যথেষ্ট মানহানী হয়েছে। তবু আসর ঠেকানোর জন্য তিনি ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন,

- হতভাগা নাস্তিকদের অভ্যাসই হলো এভাবে কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করা। এসবের আসল ব্যাখ্যা কি সেটা না জেনে মানুষদের বিভ্রান্ত করা। কেবল যুদ্ধের কথাগুলো এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু অন্য আয়াতে বলা

হয়েছে, দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নেই। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। এসব আয়াতের কি ব্যাখ্যা দেবে তারা? আমি আমার প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করি, এসব আয়াতের কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?

মুজিবুল হক হেসে বলেন,

- এসব আয়াতের ব্যাখ্যা আমি দেবো কেনো? আয়াত আপনাদের ব্যাখ্যাও দেবেন আপনারা। আমাকে বুঝিয়ে দেন এক আয়াতে বলা হচ্ছে জবরদস্তি নেই অন্য আয়াতে বলছে জিজিয়া না দিলে বা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। সাহাবাদের কাহিনীতে আমরা দেখছি একদল কাফির যুদ্ধ করতে চাচ্ছে না তবু তাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে। এর মাঝে কি ব্যাখ্যা হয় সেটাই তো আমার প্রশ্ন। সেই ব্যাখ্যা তো দেবেন আপনারাই। এর মধ্যে কোনটাকে ভুল বলবেন আর কোনটাকে ঠিক বলবেন সেটা ভেবে দেখুন। নাকি বলবেন তরবারি নিয়ে কারো উপর ঝাপিয়ে পড়ে হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতে বা জিজিয়া প্রদান করতে বাধ্য করাটা জবরদস্তি নয়। এমন বললে কোনো বুদ্ধিমান

লোক কি আপনাদের কথা মেনে নেবে? এখন ঐ একই প্রশ্ন আমি আপনাকে করছি। এসব আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কি হবে?

নিজের তীর নিজের দিকেই ঘুরে এসেছে দেখে মুফতি সাহেব পুরা ভেবাচেকা খেয়ে গেলেন। আসলে এসব আয়াতের কি ব্যাখ্যা হয় সেটা তার জানা নেই। এমন গ্যাড়াকলে তিনি এর আগে কখনও পড়েন নি তাই এসব নিয়ে সেভাবে ভাবেননি। এদিকে মুজিবুল হক বারংবার বলতে থাকে,

- বলুন, কি ব্যাখ্যা হবে বলুন।

মুফতি সাহেবের গলা দিয়ে কোনো কথাই বের হতে চায় না। দু'এক বার কিছু একটা বলার চেষ্টা করেও তিনি বলতে পারেন না।

মুফতি সাহেবের দিকে তাকিয়ে উপস্থাপক বললেন,

- আপনার এখনও কয়েক মিনিট সময় আছে দয়া করে কিছু বলুন।

মুফতি সাহেবে মুখে কিছুই বললেন না। কেবলই হাত দ্বারা ইশারা করে মুজিবুল হককে দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ

তার আর কিছুই বলার নেই। মুজিবুল হক যা খুশি বলতে পারে।

নাপাক কমিটির সদস্যরা আবারো হৈ হুল্লোড় করে উঠলো। তারা তাদের দাদাজানকে জিন্দাবাদ দিতে গিয়েও থেমে গেলো। জিন্দাবাদ শব্দটি বলা যাবে না। আবার আপাতত জিন্দাবাদ ছাড়া অন্য কোনো শব্দও মাথায় আসছে না।

মুজিবুল হক আবারো শুরু করলেন,

- সূরা বাকারা ২২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, পুরুষকে নারীর উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, পুরুষ নারীর কর্তা। সহীহ বুখারীতে এসেছে আল্লাহর রসুল বলেছেন, যে জাতি নারীকে নিজেদের উপর কর্তৃত্ব দেয় তারা কখনও সফল হবে না। এর পরও কি আপনি বলবেন ইসলাম নারী-পুরুষে সমতায় বিশ্বাসী?

হুজুর বললেন,

- অবশ্যই বলবো। কেবল সমান নয় বরং ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়ে বেশি দিয়েছে। দেখুন একজন

ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, কার হক আগে আদায় করবো? তিনি বললেন, তোমার মায়ের, এভাবে সে তিনবার প্রশ্ন করলে রসুলুল্লাহ ﷺ তিনবারই বললেন তোমার মায়ের। শেষে বললেন, তোমার বাবার। এ থেকে বোঝা যায় মেয়েদের হক বরং বেশি।

মুজিবুল হক মুচকি হেসে বললেন,

- দেখুন আপনি নিজে মুখেই স্বীকার করছেন ইসলাম নারীকে পুরুষের চেয়ে বেশি দিয়েছে। তবুও তো সেই একই প্রশ্ন থেকে যায়, এটা কি সমতা হলো নাকি অসমতা? মেয়েদেরই বা কেনো বেশি হবে? সমান কেনো হবে না।

কথাটা শুনে হুজুর পুরা চুপসে গেলেন। উপস্থিত নাস্তিকরা আবারও দাদাজান, দাদাজান বলে শ্লোগান দিয়ে উঠলো।

উপস্থাপক ঠান্ডা মেজাজে মুফতি সাহেবকে প্রশ্ন করলেন,

- আপনার কি কিছু বলার আছে?

মুফতি সাহেব মাথা নেড়ে নাকচ করে দিলেন। সাথে সাথে মুজিবুল হক তাকে পাকড়াও করলেন।

- তাহলে আপনাকে স্বীকার করতে হবে আপনার ধর্ম ভুল।

মাদ্রাসার অনেক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলো। কথাটা শুনে তারা চিৎকার করে প্রতিবাদ করলো। জনগনও কথাটা শুনে বেশ চটে গেলো। শুধু পুলিশ প্রহরা ছিল বলে রক্ষা। তা না হলে পিটিয়ে তারা আজ মুজিবুল হককে তিলপিঠে বানিয়ে ফেলতো। অবস্থা বেগতিক দেখে মুজিবুল হোক কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন,

- কমপক্ষে এতটুকু স্বীকার করুন যে, আপনি আপনার নিজের ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানেন না। না জেনেই এতটাকাল মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন আর কেবলই এতীমের হক মেরে খেয়েছেন।

হুজুর রেগে আগুন হয়ে গেলেন,

- কে বলেছে আমি এতীমের হক মেরে খায়। পয়ষটি বছরের জিন্দেগীতে আমি কখনও হারাম খেয়েছি এমন কেউ বলতে পারবে না।

- সত্যিই তো! আপনি এমন বুয়ুর্গ লোক হারাম খাবেন কেনো? তবে একটা প্রশ্ন করি, গতকাল দুপুরে ভাত

খেয়েছেন কি তরকারী দিয়ে?

হুজুর বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,

- কেনো?

মুজিবুল হোক মুচকি হেসে বললেন,

- এমনিতেই। বলুন না একটু।

হুজুর কিছুক্ষণ নিরব থেকে বিষয়টি স্মরণ করেন।
তারপর বলেন,

- ছাগলের মাংস আর ডাল।

- ছাগলের মাংস কোথা থেকে এসেছিলো?

- একজন মাদ্রাসায় দান করেছিলো।

- দান করেছিলো কি হুজুরদের জন্য নাকি এতীম
ছাত্রদের জন্য?

হুজুর এতক্ষণে বিষয়টা বুঝতে পারেন। মুখ কাচুমাচু
করে বলেন,

- তা তো আমি জানতাম না।

মুজিবুল হক তখন রাতুলকে দাঁড় করিয়ে বলেন,

- দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?

মুফতি সাহেব তাকে চিনতে পারেন। আর সাথে সাথেই লজ্জায় তার মাথাটা হেট হয়ে আসে। এই ছেলেটিই গতকাল মানতের ছাগলটি তার হাতে ভুলে দিয়ে বলেছিলো,

- মায়ের মানত ছিলো এতীম ছাত্রদের খাওয়াবেন।

এমনিতেই হানাতী মাজহাবের ফতোয়া হলো, মানতের ছাগল কেবল গরীব-মিসকীনকে খাওয়াতে হয়। তার উপর যখন দাতা নিজেই এতীম কথা উল্লেখ করে তখন তা যে অন্য কারো খাওয়া সাজে না সেটা বিলক্ষণ সত্য। কিন্তু ছাগলের মাংস রান্না হওয়ার পর যে সুন্দর সুবাস বের হয় তা নাকে গেলেই মুফতি সাহেবরা এসব ফতোয়া ভুলে যান। তখন হালাল-হারাম না ভেবে যতটুকু সম্ভব পেটে ভরতে না পারলে জীবনটাই বৃথা মনে হয়। জীবনে কতগুলো এতীমের ছাগল এভাবে তার পেটে ঢুকেছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। তার স্পষ্ট মনে হয়, ঐ সব হারাম খাবারের দোষেই আজ তাকে আল্লাহ হাতে করে

এমন অপমান করেছেন। এটা আল্লাহরই গজব। তবু কি তারা সংশোধন হবেন? হারাম খাওয়া যাদের অভ্যাস হয়ে যায় সংশোধন হওয়া তাদের জন্য বেশ কষ্টকরই হয়।

বিতর্কের শেষে আতিকের সাথে আবারো দেখা হয়েছিলো রিয়াদের। অবস্থা দেখে মনে হলো মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। বিতর্কের ফলাফল যে এদিকে মোড় নিতে পারে তা হয়তো স্বপ্নেও ভাবেনি। রিয়াদ তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করলো না। হিতে বিপরীত হতে পারে। দাদাজান তাকে মঞ্চে ডাকছিলেন। তাড়াতাড়ি সেদিকে গিয়ে সে দাদাজানের হাত ধরে চেয়ার থেকে দাঁড় করালো। আতিকও এসেছিলো তার মুফতি সাহেবকে তুলে নিয়ে যেতে। দুজনের আবারো চোখাচোখি হলো। রিয়াদ মুচকি হাসলো। কিন্তু আতিকের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

সেদিন বিতর্কে বিজয়ী হওয়ার পর থেকে অবস্থা অনেক পাল্টে গেলো। ইতোমধ্যে শিমুল আর রাতুল ফেসবুকে বিতর্কের যাবতীয় খুটিনাটি পোষ্ট করে দিয়েছে। সেই সাথে আবারো যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে বিতর্কে বসার ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিয়েছে। সেখানে পুরোদমে

চলছে লাইক, কमेंট, শেয়ার। অবস্থা দেখে নাস্তিকদের পোয়া বারো। আসলে ইতিহাসে এতো বড় বিজয় নাস্তিকরা আর কখনও অর্জন করেছিলো বলে শোনা যায় না। মোল্লা-মৌলবীরাও তাই বেশ খানিকটা কোণঠাসা হয়েই রয়েছে বিতর্কের পর থেকে। নতুন কোনো বিতর্ক তো নয়ই পুরোনো বিতর্কের খবরটা পর্যন্ত শুনতে চাইছে না।

এদিকে মুজিবুল হক সারা দেশের নাস্তিকদের নিকট মহাপুরুষে পরিণত হলেন। দেশ-বিদেশে এই বিতর্কের খবর ছড়িয়ে গেলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে তার কাছে ফোন আসতো। অনেকেই তার বাড়িতে পর্যন্ত আসতো তার সাথে দেখা করার জন্য। ফুলের তোড়া নিয়ে দল বেধে আসতো কলেজ আর ইউনিভার্সিটির নব্য নাস্তিকরা। দাদার কাছে লেকচার শুনে নিজেদের কানকে ধন্য করতো তারা। কোথাও নাস্তিকদের কোনো সমাবেশ হলে তাকে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হতো। সুযোগ বুঝে দাদাজানও নিজের কমিটিকে পারিবারিক সীমা পেরিয়ে সামাজিক সীমায় বদলী করার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলেন। নতুন এই কমিটির নাম দেন “নাস্তিকতায়

জাথত সমাজ” সংক্ষেপে ‘নাজাস’। সারা দেশের কয়েক হাজার তরুন তরুনী সেই কমিটিতে সদস্য হলো। নাতি-নাতনীরা কমপক্ষে এতটুকু ভেবে খুশি হলো যে, আর যাই হোক নাপাক নাম তো ঘুচলো। কিন্তু সামান্য আরবী জানলে তারাও বুঝতে পারতো পারিবারিক সীমা পেরিয়ে সামাজিক পর্যায়ে বদলী হওয়ার পরও নাস্তিকদের নাপাক কমিটি নাপাকই থেকে গেলো। যাই হোক তা নিয়ে কমপক্ষে দাদাজানের কোনো মাথা ব্যাথা নেই। কারণ এ সবই ইসলামী পরিভাষা। যার এক পয়সা গুরুত্ব নেই তার কাছে।

পাঁচ.

মুফতি সাহেব সেদিন বিতর্কে হেরে যাওয়ার পর থেকে আতিকের মানসিকতা অনেকখানি পাল্টে গেলো। আগে তো সে নিজের মাদ্রাসার উস্তাদদের সর্বাপেক্ষা বড় বুয়ুর্গ মনে করতো। তার বিশ্বাস ছিলো এরাই আল্লাহর ওলী। এদের মতো জ্ঞানী আর সম্মানি লোক ত্রিভুবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেদিন প্রমানিত হলো, একটা বুড়ো নাস্তিকের সমান জ্ঞানও এরা রাখে না। তাছাড়া এরা হারাম খোর এবং অন্যান্য অনেক অপকর্মে

লিপ্ত যা আতিক জানে। কিন্তু জেনেও এতদিন চোখ
 থাকতেও অন্ধের মতো বিনা বাক্যে হজম করে গেছে।
 কত কথা বুঝতে না পেরেও বিনাবাক্যে তা মেনে
 নিয়েছে। হুজুররা যে ফতোয়া দিয়েছে তাই মেনে নিয়েছে
 কিতাব খুলে দেখেনি কখনও। ভেবেছে হুজুররা কি আর
 ভুল শেখাবে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল শেখাতেও
 পারে। যারা এতীমের সম্পদ ফাঁকি দিয়ে খেতে পারে
 তারা এলেমের ব্যাপারেও ফাঁকিজুকি করতে পারে। এখন
 থেকে তাই সে চোখ কান খোলা রাখবে। বড় বড়
 কুরআনের তাফসীর আর হাদীসের শরাহ নিজেই পড়ে
 দেখবে আসলে ইসলাম কি বলে। এতদিনও অবশ্য সে
 প্রচুর পড়াশোনা করতো কিন্তু সেটা ছিলো মাদ্রাসার
 শিক্ষক আর সিলসিলার বড়দের লেখা বই পুস্তক। যা
 বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে লেখা হয়েছে।
 ইসলামের প্রথম যুগের বড় বড় আলেমদের লেখা মূল
 কিতাবগুলো সে খুব কমই খুলে দেখতো। কিন্তু এখন সে
 সিলসিলার বড়দের বই বাদ দিয়ে নামকরা সব বড় বড়
 আলেমদের প্রাচীন গ্রন্থগুলো পড়বে। এর অংশ হিসেবেই
 সে বিতর্কের দিন বুড়ো নাস্তিকের মুখে শোনা আয়াত
 আর হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা পড়তে শুরু করলো। আরবীতে

ভালো মতো জ্ঞান না থাকলেও উর্দুতে সে বেজায় বিজ্ঞ। মাদ্রাসার লাইব্রেরীতে আরবীর পাশাপাশি উর্দু কিতাবও আছে ঢের। আছে বিভিন্ন বিখ্যাত সব তাফসীর আর শরাহর বইয়ের উর্দু অনুবাদ। অতএব, নিজ চেষ্টায় পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে মোটেও অসম্ভব হবে না।

বিতর্কের ঘটনাটা তার মোবাইলে রেকর্ড করা আছে। ভলিউম যথাসম্ভব কমিয়ে মোবাইলটা কানের কাছে ধরে মাঝে মাঝে এখনও আলোচনাটা শোনে সে। জোরে শোনা যাবে না। তাহলে মাদ্রাসার শিক্ষকরা রেগে যাবে। এভাবে শুনে শুনে বক্তব্যের মধ্যে উভয় পক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীস এসেছে সেগুলো নোট করে নিলো আতিক। পরে আয়াতের তাফসীর আর হাদীসের শরাহ দেখতে থাকলো। আর সাথে সাথেই বড় রকমের একটা ফাঁকিজুকি ধরা পড় গেলো তার কাছে। বুড়ো নাস্তিকটা জিজিয়া না দিলে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো, মুরতাদকে হত্যা করো এমনি যেসব আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করেছিলো সকল আলেমরা সেগুলোর ঐ ব্যাখ্যাই করেছেন যা নাস্তিকটা করেছিলো। কোনো কাফির

সম্প্রদায় মুসলিমদের উপর আক্রমণ না করলেও তাদের উপর আগে আক্রমণ করা ফরজে কিফায়া হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত হয়েছেন যদি না তারা জিজিয়া আদায় করতে রাজি হয়। মুর্তাদ যুদ্ধ করুক বা না করুক তাকে তওবা করার জন্য তিন দিন সময় দেওয়ার পরও যদি সে তওবা না করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে এ ব্যাপারেও সকল আলেম ইজমা করেছেন।

- তবে কি বুড়ো নাস্তিকটা ঠিকই বলেছে? হুজুর অবশ্য বলছিলেন, এসব আয়াত মানসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো আলেম তো একথা বলছেন না।

মনে মনে ভাবে আতিক। তারপর বিড়বিড় করে বলে,

- এবারে হুজুরের উল্লেখ করা আয়াতগুলো দেখতে হবে।

সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা দেখতে গিয়ে তো সে পুরো হতবাক হয়ে গেলো। প্রথমেই দেখলো দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তি নেই এই আয়াতের তাফসীর। কি আশ্চর্য! এই আয়াতটিকেই তো কোনো কোনো আলেম মানসুখ বলেছেন। যারা মানসুখ বলেননি তারাও বলেছেন এটা

মাখসুস। তাফসীরে বাইযাবীতে সংক্ষেপে সুন্দর করে এই কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ জবরদস্তি নেই কথাটা সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। এর মানে কোনো কোনো জায়গায় জবরদস্তি আছে কোনো কোনো জায়গায় নেই। আলেমরা উদাহরণ দিয়ে বলেও দিয়েছে। যেমন জিজিয়া না দেওয়া পর্যন্ত জবরদস্তি আছে। কিন্তু জিজিয়া দেওয়ার পর আর মুসলিম হতে বাধ্য করা যাবে না। অর্থাৎ এই আয়াতটা ব্যবহার করে দ্বীনের মধ্যে আদৌ কোনো জবরদস্তি নেই এমন দাবী করাটা সুস্পষ্ট চালবাজী ছাড়া কিছু নয়।

- মুফতি সাহেব তবে এমনই ফাঁকিবাজী করলো? আরো একবার শুনি তো তার বক্তব্যটা।

আতীক কানের কাছে মোবাইল রেখে আরো একবার মুফতি সাহেবের কথাটা শুনলো।

- হু ঠিকই আছে। উনি তো জিজিয়ার আয়াতকে মানসুখ বলছেন আর জবরদস্তির আয়াতকে উল্লেখ করে দ্বীনের মধ্যে আদৌ কোনো জবরদস্তি নেই এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। পুরা এলেমটাকেই তো তিনি উল্টে দিয়েছেন। এ কেমন ফাঁকিবাজী রে বাবা!

রহমাতুল লিল আলামীন তথা রসুল সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ আয়াতটির তাফসীর পড়তে গিয়ে দেখলো কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে সমগ্র সৃষ্টি বলতে কেবল মুমিনদের বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছে, কাফিরদেরও বোঝানো হয়েছে তবে উদ্দেশ্য হলো রসুল আছেন বলে কাফিরদের উপর আকাশ থেকে গজব এসে আদ বা ছামুদ জাতির মতো ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে যে রসুল আদৌ কোনো যুদ্ধ করবেন না রহমতের নবী বলতে এটা বোঝানো হয়নি বরং ভিন্ন বিষয় বোঝানো হয়েছে। যেহেতু যুদ্ধের প্রমাণ তো অন্য আয়াতে রয়েছেই। এমনকি এই আয়াতের পরের আয়াতেও সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে (سَوَاءٌ فُتِلَ أَدْنَتْكُمْ عَلَى) “আমি তোমাদের স্পষ্ট সতর্কবার্তা শুনিয়ে দিচ্ছি”। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বহু সংখ্যক আলেম বলেছেন, এখানে আসলে যুদ্ধের বার্তার কথা বলা হচ্ছে।

এসব ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে এই আয়াতটি উল্লেখ করে জিজিয়ার আয়াতকে মানসুখ প্রমাণের চেষ্টা করা কত বড় চালবাজী তা ধরতে পেরে আতিকের মনটা বিধিয়ে

ওঠে। সে ভাবে,

- একটা নাস্তিক ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা জানে আর মুফতি হুজুর বিষয়টা জানে না? নাকি জেনেও না জানার ভান করে? কেবলই আসর ঠেকানোর জন্য বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলে?

হঠাৎ তার মনের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রনা জেগে ওঠে।

- তবে কি ইসলাম সত্যিই সন্ত্রাসবাদ আর অসমতার ধর্ম। তবে কি নাস্তিকরাই সঠিক?

কথাটা মনে হতেই বেদনায় তার বুকটা ভেসে যায়। এতটা বছর যে আকীদা-বিশ্বাসকে ধারণ করে বড় হয়েছে সেটা কি তবে তাকে হারাতে হবে? কিতাবগুলো বুক জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে।

এই মুহর্তে হঠাৎ করে বড় আতিক এসে লাইব্রেরী রুমে হাজির হলো। দুই আতিক খুব বেশিক্ষণ একে অপরের কাছ ছাড়া হয়ে থাকে না। কেবল ছোট আতিক যখন পড়াশোনা করে বড় আতিক কিছুক্ষণ তার পাশে বসে থেকে একটু পর বিরক্ত হয়ে উঠে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন মনে হয় পড়াশুনা হয়তো শেষ হয়েছে তখন ফিরে

এসে আবার দুজন এক সঙ্গে ঘুরা ফিরা করে। ঠিক যেমন এখন এসে হাজির হয়েছে। এসেই সে দেখলো তার ছোট ভাই হাউ মাউ করে কাঁদছে। দেখে তো প্রথমটাই তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। জীবনে কখনও তারা দুই ভাই এভাবে কান্নাকাটি করেনি। সে শুনেছে আল্লাহর ওলীরা জাহান্নামের ভয়ে এভাবে কাঁদে আর দুনিয়াদার লোকেরা দুনিয়ার মূল্যবান কিছু হারিয়ে গেলে কাঁদে। তারা না আল্লাহর ওলী আর না তাদের দুনিয়াতে কোনো মূল্যবান কিছু আছে যা হারিয়ে যাবে। মূল্যবান যা ছিল সেই পিতা-মাতা ছোট বেলায় তাদের ছেড়ে চলে গেছে। বড় ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনে মিলে দায়িত্ব করে এই মাদ্রাসার এতীম খানায় ভর্তি করে দিয়ে গেছে। তাদের অতীত বলতে কেবল এটুকুই জানা আছে। বাকীটা স্মৃতি এই মাদ্রাসাকে ঘিরে। সারাদিন রাস্তা-ঘাটে টাকা-পয়সা তুলে মুহতামিম সাহেবের হাতে জমা দেওয়া আর বিনিময়ে দু বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে পাওয়া আর নাম মাত্র আরবী, ফার্সী আর উর্দু ভাষার উপর শিক্ষা গ্রহণ করা। এভাবেই তো বেশ চলে যাচ্ছে। এর মাঝে এমন কি ঘটলো যাতে কেঁদে একেবারে বুক ভাসিয়ে ফেলতে হবে? আসলে তার ছোট ভাই কি মহা মূল্যবান জিনিস

হারাতে বসেছে তা যদি সে জানতো তবে সে নিজেও
শোকে মাতম করতো।

বড় আতিক তখন ছোট ভাইয়ের দেহটাকে দুই হাতে
চেপে ধরে ব্যাকুল হয়ে বলে,

- এই কি হয়েছে? কাঁদছিস কেনো?

কান্না কিছু মাত্র না থামিয়েই ছোট আতিক বলে,

- ঐ বুড়ো নাস্তিক।

বুড়ো নাস্তিকের উপর মাথায় এমনিতেই রাগ চড়ে ছিলো।
ছোট ভাইয়ের মুখে এমন কথা শুনে সেই রাগ বহু গুনে
বেড়ে গেলো। রাগত স্বরে বলল,

- কি হয়েছে শুধু বল ঐ বুড়োকে আমি খুন করে
ফেলবো।

নিজের মাথাটা ডান থেকে বায়ে নাড়িয়ে ছোট আতিক
আবার বলে,

- বুড়ো নাস্তিক ঠিক কথা বলেছে। আর মুফতি সাহেব
আমাদের ফাঁকি দিয়েছেন।

কথাটা বলে হাতের কিতাবটির দিকে ইশারা করে সে। কিন্তু কথাটা শুনে বড় আতিকের মস্তিস্কে বিদ্যুৎ খেলে যায়। নিজের দু'হাত আলাগা করে ছোট ভাইকে ছেড়ে দেয়। হঠাৎ বন্ধনমুক্ত হয়ে তার ছোট ভাই মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। এসব দেখে মায়া হওয়ার বদলে বড় আতিকের মনে কেবলই রাগের সৃষ্টি হয়,

- তুই নাস্তিক হয়ে গেছিস? বুয়ুর্গদের শানে বাজে কথা বলছিস?

এভাবে দু'একবার চিৎকার করে শেষে নিজেই নিজের মুখটা দুহাতে চেপে ধরে। এখনই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া অনুচিত। মুহতামিম সাহেব শুনলে এই মুহুর্তে তাদের মাদ্রসা থেকে বের করে দেবে। পথে বসতে হবে তখন। তার আগে বরং নিজের ভাইকে কোনো মতে বুঝিয়ে শুনিয়ে পথে আনা যায় কিনা সেটা চেষ্টা করে দেখতে হবে।

বিষয়টা অবশ্য বেশিদিন গোপন রাখা গেলো না। প্রথমত এই ঘটনার পর দুই আতিকের মাঝে কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো যা মাদ্রাসার ইতিহাসে কখনও কেউ ঘটতে দেখেনি। এ থেকে কিছু একটা ঘটেছে এমন সন্দেহ

করেছিলো সবাই। বড় আতিককে চেপে ধরে পিড়াপিড়ি করাতে সেও আকারে ইঙ্গিতে কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলো। তাছাড়া ছোট আতীক নিজেই মুফতি সাহেবের সাথে কথা বলেছিলো। তিনি যে চরম চালবাজীটা করেছেন সেটা তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। আর অনুনয় করে বলেছিলো,

- আপনার কাছে অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকলে দয়া করে সেটা উল্লেখ করে আমার ঈমানটা রক্ষা করুন। তা না হলে আমি কিন্তু শেষে নাস্তিক হয়ে যাবো। আর এর দায়ভার কিছুটা গিয়ে আপনাদের উপর পড়বে।

মুফতি সাহেব নির্বিকারভাবে বলেছিলেন,

- সেদিন যে ব্যাখ্যা দিয়েছি ওটা ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। তাতে তুমি নাস্তিক হও আর মুরতাদ হও আমার কিছু যায় আসে না।

রাগত স্বরে আতিক তাকে বেশ একটা কড়া কথা বলেছিলো। বলেছিলো,

- হারাম হালাল যে কোনো পন্থায় নিজের পেটটা ভরানো ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে আপনাদের তো আসলেই যায়

আসে না।

তাতেই মুফতি সাহেব তার উপর তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। মুহতামিম সাহেবকে বলে তৎক্ষণাৎ মাদ্রাসা থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেন। নিজের জামা-কাপড়গুলো পুটলার মাঝে ভরে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে পড়ে ছোট আতিক। বড় আতিক তখন কোথায় ছিলো সে জানে না। হয়তো মাদ্রাসার কোনো কোনো দাঁড়িয়ে ছোট ভাইয়ের গমন অভিমুখে অপলোকে তাকিয়ে ছিলো। হয়তো রাগে তার গা জ্বলে উঠেছিলো কিংবা দুঃখে হয়তো তার দুই গাল জলে ভিজে গিয়েছিলো। ঠিক কি হয়েছিলো ছোট আতিক সেটা আর জানতে পারেনি। কেবল অসুস্থ মানুষের মতো দুলে দুলে স্টেশনের সেই স্থানে দাড়ালো যেখানে বেশ কিছু দিন আগে রিয়াদের সাথে তাদের দুই ভাইয়ের প্রথম পরিচয় হয়েছিলো। সেদিন সে দুজনের মাঝে কোনো একটা পার্থক্য খুঁজে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলো। আজ সে সেই পার্থক্য খুঁজে পাবে। কে জানে হয়তো তাকে পেয়ে সে খুশিই হবে।

হয়.

রিয়াদ সেদিন একটু রাত করেই বাড়ি ফিরলো। মাঝে মাঝেই এমন করে সে। হয়তো শিমুলে সাথে অথবা নিজেই রাতের বেলা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। রাতের পৃথিবীটা সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগে তার কাছে। বাড়ি ফিরে পরিবেশটা কেমন যেনো আলাদা আলাদা লাগলো। আসা করেছিলো সবাই হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়জোর দাদাজান হয়তো তার অপেক্ষায় বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকবেন। অন্য কেউ নয় কেবল রিয়াদের জন্য এতটুকু অতিরিক্ত নজর রাখেন তিনি। অন্য সব নাতি নাতনীদের সাথেও একই রকম রক্তের সম্পর্ক থাকলেও রিয়াদের সাথে তার সম্পর্কটা কেনো জানি সব সময় অনেক বেশি দৃঢ় মনে হয় তার কাছে। কিন্তু অবাক হয়ে রিয়াদ লক্ষ্য করলো, সভা কক্ষ থেকে হৈ ছল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে। বাড়িতে যেনো একটা উৎসবের আয়োজন চলছে। কাবাবিয়া হোটেলের মিষ্টির গন্ধও যেনো নাকে আসছে। ব্যাপার কি বোঝার জন্য সে দ্রুত সভাকক্ষে হাজির হলো। দাদাজান তার আসনেই বসে ছিলেন। তাকে দেখেই রহস্যময় একটা হাসি দিলেন। আজকাল তিনি সব সময়ই ফূর্তিতে থাকেন। অতএব তার হাসিতে বিশেষ কিছু আঁচ পাওয়া

গেলো না। এদিক সেদিক চোখ বুলাতে বুলাতে হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এক কোনে বসে থাকা টুপি পাঞ্চগবী পরা একটা যুবক। শিমুল হয়তো আবারো মিলাদ পড়ানোর নাম করে কোনো হুজুরকে ধরে এসেছে। বেচারি কিছু বুঝে ওঠার আগেই হয়তো নাজাস কমিটিতে ভর্তি হয়ে গেছে। মনে মনে হুজুরটার জন্য মায়াও যেমন হলো, পুরা বিষয়টা কল্পনা করে বেশ একটা রসবোধেরও সৃষ্টি হলো রিয়াদের ভিতরে। ধীর কদমে হেঁটে গিয়ে হুজুরটার পাশে দাঁড়ালো। কেউ একজন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে ছেলেটা মাথা তুলে তাকাতেই রিয়াদ তো আকাশ থেকে পড়লো।

- এ যে, আতিক!

পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কি করা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে রিয়াদ বেশ একটা অন্যায় কাজই করে ফেলল। তড়িঘড়ি করে বলল,

- আস সালামু আলাইকুম।

আতিক তার সালামের জবাব দিলো। আর তখনই রিয়াদ জিভে কামড় দিলো। নাস্তিকতায় জাগ্রত সমাজের এটা

কেন্দ্রীয় অফিস। সেখানে বসে সালাম-কালাম লেনদেন করা মারাত্মক অপরাধ। আড় চোখে দৃষ্টি দিয়ে দেখলো দাদাজান তার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তাড়াতাড়ি কিছু একটা বলে দাদাজানের মেজাজটা ঠান্ডা করা দরকার। শিমুল হলে এতক্ষণে কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলতো। উপস্থিত বুদ্ধিতে যে আবার পাকা উস্তাদ। কিন্তু রিয়াদের মাথায় কোনো বুদ্ধিই উদয় হলো না। শেষে শিমুলের কাছে ধার করা পুরোনো বুদ্ধিটাই কাজে লাগালো। দাদাজানের দিকে তাকিয়ে হি হি করে হেসে বলল,

- মানুষ অভ্যাসের দাস।

কথাটা শুনে সভাকক্ষের লোকেরা হো হো করে হেসে উঠলো। তাদের ওভাবে হাসতে দেখে রিয়াদ বেশ অবাকই হলো। এমন কি অন্যায় কথা সে বলেছে যে ওভাবে হাসতে হবে। দাদাজান যেনো তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। ঠান্ডা মেজাজে বললেন,

- আহা! হাসছো কেনো। নতুন মানুষ, ভুল তো হতেই পারে।

এক কোণ থেকে রাতুল বলল,

- কিন্তু নানা, সালাম তো প্রথমে দিয়েছে

কথাটা বলেই সে রিয়াদের দিকে তাকালো। অর্থাৎ তার মুখটা বন্ধ করার জন্য কত টাকা ঘুষ দিতে রিয়াদ রাজি তা জানতে চায়। রিয়াদ আঙ্গুলি দ্বারা পাঁচ ইশারা করলো যার অর্থ পাঁচ টাকা থেকে শুরু করে পাঁচ শত বা এমনকি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এমন অনিশ্চিত ঘুসের ওয়াদা করে হলেও রাতুলের মুখটা বন্ধ করা গেলো। হঠাৎ সে তার কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল,

- প্রথমেই সালাম আর শেষের সালামের মাঝে এমন কি পার্থক্য। সবই হলো মানবীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি।

তার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথার আগা মাথা কিছুই দাদাজান বুঝতে পারলেন কিনা বোঝা গেলো না। তবে স্পষ্ট বোঝা গেলো তার রাগ পড়ে গেছে। তারপর আবার সবাই যে যার মতো শোরগোল করতে শুরু করলো। সেই ফাঁকে রিয়াদ আতিকের পাশে বসে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগলো।

- কি ব্যাপার? একেবারে নাস্তিকদের আড্ডাখানায় এসে

হাজির!

আতিক এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না। কেবল লাজুকভাবে হাসলো।

- ঘটনা কি একটু শুনি।

এবার আতিক তার কাহিনীটা মোটামুটি বিস্তারিত ভাবেই শোনালো। সেদিনের বিতর্ক অনুষ্ঠানে মুজিবুল হকের উল্লেখ করা দলীল প্রমাণগুলো যাচাই করে তার কথার সত্যতা খুঁজে পেয়েছে সে। সেই সাথে মুফতি সাহেবের চালবাজিও ধরে ফেলেছে। নিজের সাথেই কয়েকটা বই সে মাদ্রাসার লাইব্রেরী থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। বইগুলো আরবী আর উর্দুতে লেখা। সেখানে ইসলাম সম্পর্কে হুবহু ঐ সব কথা লেখা আছে যা মুজিবুল হক বলেছেন। হজুরদের কাছে বারবার প্রশ্ন করেও কোনো সদুত্তোর পাওয়া যায়নি। তাই শেষমেষ নাস্তিকদের আড্ডাখানায় যোগ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকলো না।

কথা শুনে মুচকি হেসে রিয়াদ বলে,

- হুম। সবই তো বুঝলাম। তবে একটা কথা বলি,

দাদাজানের সাথে তাল মিলিয়ে থাকুন। কিন্তু পাঁকা নাস্তিক হওয়ার দরকার নেই।

আতিক যেনো আকাশ থেকে পড়লো।

- কেনো?

- কারণ খুব সহজ। আপনাকে বুঝিয়েই বলছি।

বলে আড় চোখে অন্য সবার অবস্থা দেখে নিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোট বুক বের করলো রিয়াদ। এদিক সেদিক পাতা উলটিয়ে একটা স্থান বের করলো। সেখানে কুরআনের একটা আয়াত লেখা।

“তারা কি কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা করে না? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তবে তাতে প্রচুর অসঙ্গতি থাকতো” [নিসা/৮২]

আতিক অবাক হয়ে বলল,

- আপনি কুরআন পড়েন?

রিয়াদ ইশারায় তাকে চুপ করতে বলল। অন্য কেউ শুনে ফেললে বিপদ।

কিন্তু আতিককে চুপ করানো গেলো না।

- আপনি নাস্তিক নন?

কোনো একটা উত্তর না পেলে তাকে চুপ করানো যাবে না এটা বুঝতে পেরে রিয়াদ ফিস ফিস করে বলে,

- ২০/২২ বছর ধরে তো নাস্তিকই রয়েছি। কিন্তু বেশিদিন হয়তো থাকবো না।

আতিক অবাক হয়ে বলে কেনো?

- ঐ যে আয়াতটা পড়লেন না। সঠিকভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে দেখা যাবে কুরআনে কোনো অসঙ্গতি নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের হুজুররা যেমন সঠিকভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে পারেনি তেমনই আমাদের দাদাজানও সঠিকভাবে কুরআনে বোঝার চেষ্টা করেনি। তাই তারা ভুল বুঝেছেন। এখন আমরা যদি সঠিকভাবে চিন্তা-গবেষণা করতে পারি তবে হয়তো তাদের ভুল শুধরে দিতে পারবো। যেসব প্রশ্নের উত্তর আপনার ওস্তাদরা দিতে পারেনি হয়তো আমি সেগুলোর উত্তর দিতে পারবো।

আতিক আক্ষেপের স্বরে বলে,

- হাতি ঘোড়া গেলো তল। পিঁপড়ে বলে কত জল।

একটা ঢোক গিলে এই অপমানটা হজম করে নিয়ে
রিয়াদ বলে,

- কিন্তু ছোট্ট একটা মশাও যে নমরুদের ভব লিলা সাঙ্গ
করতে পারে তা ভুলে গেলে চলবে না।

কথাটা যেনো জাদুর মতো কাজ করে। রিয়াদের দুহাত
চেপে ধরে আতিক বলে,

- সত্যিই কি আপনি পারবেন? যদি আমার প্রশ্নগুলোর
উত্তর দিয়ে আমার হারানো ঈমান ফিরিয়ে দিতে পারেন
তবে সারাটা জীবন আমি আপনাকে গুরু বলে মানবো।

হালকা হেসে রিয়াদ বলে,

- আপনার মতো সাগরেদ পেলে তো আমার জীবনটাই
ধন্য হয়ে যাবে। রাস্তা-ঘাটে ভিক্ষা করতে লাগিয়ে দিয়ে
সারাটা জীবন বসে খাওয়া যাবে।

লজ্জায় মাথাটা নিচু করে আতিক বলে,

- সেটা কিন্তু বিগত সময়ের কথা। এখন তো আমি ওসব
ছেড়ে দিয়েছি।

রিয়াদ আবারো হেসে বলে,

- কিন্তু ছেড়ে দিয়ে যাদের দলে ভিড়েছেন তাতে তো আপনার পরিনতি তদাপেক্ষা খারাপ হবে বলেই মনে হচ্ছে।

আতিক মিনতি করে বলে,

- সে কারণেই তো বলছি। যদি আপনি সত্যি সত্যিই আমাকে বোঝাতে পারেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।

রিয়াদ তাকে শান্তনা দিয়ে বলে,

- ধীরে বন্ধু ধীরে। এত তাড়াছড়ো করলে তো সবই বানচাল হয়ে যাবে।

কৌতুহলী দৃষ্টিতে রিয়াদের দিকে তাকিয়ে আতিক বলে,

- কিন্তু কিভাবে হবে?

রিয়াদ বলে,

- আপনি যেমন হুজুরদের চালবাজী ধরে ফেলেছেন আমিও তেমনি দাদাজানের কথার কিছু ফাঁক ফোকড়

ধরে ফেলেছি।

আতিক আগ্রহী হয়ে বলে,

- যেমন? একটু বলুন না!

হালকাভাবে মাথা নেড়ে রিয়াদ বলে,

- একবারে সব কথা খুলে বললে গুরুর কি আর কোনো গুরত্ব থাকবে। আগে সেগুলো ভাল মতো সাজিয়ে নিই তারপর নাস্তিকতাকে আমি উল্টে দেবো।

বলে নিজের ডান হাতটি উল্টো করে বাম হাতের উপর রেখে আতিককে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলো। তার এই কথা শুনে আতিকের মনের মাঝে কি যে আনন্দ দোল খেলো তা বলার নয়।

এরপর দাদার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

- এখন যে যার ঘরে চলে যাও। কাল থেকে আমাদের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

কাল থেকে দাদাজান কার্যক্রম শুরু করলেন। প্রথমেই রাতুল আর শিমুলকে বললেন, আতিকের একটা ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করার জন্য। একজন ছজুরের

নাস্তিকতার গল্প শিরোনামে উভয়ে আতিককে নিয়ে পোষ্ট
 করলো। তাছাড়া অন্য যত উপাই উপকরণ আছে তা
 ব্যবহার করে দাদা আতিকের খবরটা দেশময় ছড়িয়ে
 দিলেন। শেষে এমনকি সাংবাদিক সম্মেলন পর্যন্ত
 করলেন। এভাবে সারাদেশের হুজুরদের মুখে চুনকালি
 লেপন করাই হয়তো তার উদ্দেশ্য ছিলো। আর এই
 চুনকালীতে মোল্লাদের মুখ এমনভাবে পুড়লো যে মুখ
 তুলে তাকানোর সৎ সাহসটাও তারা হারিয়ে ফেললো।
 তারা কেবলই আবোল-তাবোল মিথ্যাচার করে গন্ডগোল
 পাকানোর চেষ্টা করলো। কেউ বলল, ঐ ছেলে মাদ্রাসার
 ছাত্রই নয়। কেউ বলল, ঐ ছেলে ইহুদী খৃষ্টানদের চর।
 কেউ বলল, সে টাকার লোভে পড়ে নাস্তিক হয়ে গেছে।
 এভাবে নানাভাবে মিথ্যাচার করে মাঠ গরম
 করলো। এত বড় বড় মাদ্রাসার বড় বড় আলেমরা কেউই
 কিস্তি পুচকে ছেলেটার প্রশ্নগুলো শুনে তার সদুত্তোর
 প্রদানের চেষ্টা করলো না। হুজুরদের এমন দায়িত্বহীনতা
 এবং নগ্ন মিথ্যাচার শুনে আতিক যেনো দিন কে দিন
 আরো বেশি নাস্তিক হয়ে উঠলো। সবার শেষে যে
 ঘটনাটি ঘটলো তাতে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার কাজ
 করলো। মোল্লারা একটা সংবাদ সম্মেলন করলো।

সেখানে আতিকের বড় ভাইকে হাজির করলো তারা।
আতিকের বড় ভাই স্পষ্টভাষায় বলল,

- সে আমার জমজ ভাই। আমি তাকে ভালো মতোই
চিনি। গোড়া থেকেই সে বোকা এবং বেয়াদব। লেখা-
পড়ায় মনোযোগ ছিলো না। কেবলই জর্দা দিয়ে পান
খেতো। আমি আগেই জানতাম সে এমন একটা কিছু
ঘটনা ঘটাবে।

তার কথা শুনে আতিক তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।
রিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলল,

- মোল্লারা এত খারাপ তা তো আগে কখনও বুঝতে
পারেনি। বেটা নিজে জর্দা আর গুল খায় আর দোষটা
আমার উপর চাপাচ্ছে।

রিয়াদ তাকে শান্তনা দিয়ে বলে,

- যারা আল্লাহকে ভয় করে না তাদের অবস্থা এমনই
হয়।

রিয়াদের মুখে আল্লাহর নাম শুনে আতিক যেনো আবারো
দোটানায় পড়ে যায়। একদিকে এসব পথভ্রষ্ট মোল্লা-
মৌলবী অন্য দিকে আল্লাহ-রসূল আর মাঝে রয়েছে

নাস্তিকরা। সব কিছু তার নিকট অস্পষ্ট আর ধোয়াসা মনে হয়। এতকিছুর মধ্যে রিয়াদের সেই কথাটা তার অন্তরে ক্ষীণ আশার সৃষ্টি করে, “নাস্তিকতাকে আমি উল্টে দেবো।”

স্নাত.

দেশের হুজুরদের তখন খুব বেহাল দশা যাচ্ছিলো। একদিকে নাস্তিকদের পক্ষ থেকে বারংবার মানহানী বিপরীতে জনগণ তাদের আবারো নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে বসানোর জন্য টানাটানি করছিলো। এহেনো পরিস্থিতিতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটলো। দেশে আলেম ওলামাদের বিভিন্ন সংঘ ও সংস্থা ছিলো। যারা সারাটা জীবনে কেবলই পরস্পরের সাথে তর্ক-বিতর্ক আর লাঠালাঠি করেছে। এই কঠিন পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য তারা সকলে একত্রে একই বৈঠকে মিলিত হলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, লাজনাই ফতোয়া। যার সঠিক বাংলা অর্থ হলো, ফতোয়া বিভাগ। কিন্তু এসব হুজুরগণ লাজ-সরম ভুলে যেভাবে রাস্তাঘাটে টাকা কালেকশন করে তাতে যে কেউ ভাবতে পারে লাজ নাই ফতোয়া বলতে লাজ-সরম নাই এমন একদল

পেটোয়া হুজুরদের কথা বলা হচ্ছে। এছাড়া ছিলো হাইয়াতু উলামায়ে মাদারেসে উম্মাহ্। যার বাংলা অর্থ উম্মতের মাসরাসাগুলোর আলেমদের সমিতি। তবে আরবী নামটি সংক্ষেপ করলে দাড়ায় ‘হাউমাউ’। সেক্ষেত্রে কার্যত এই সব মাদ্রাসার শিক্ষক আর ছাত্ররা টাকা দাও, পয়সা দাও, ফল আর ফসল দাও, কুরবানীর চামড়া দাও এসব দাবিতে রাস্তা-ঘাট আর পাড়া মহল্লায় মানুষদের নিকট যেভাবে হাউমাউ করে বেড়ায় নামটির মাঝে তারই চিত্র ফুটে ওঠে। যাই হোক, সারাটা জীবন হাউমাউ, খাওখাও করে বেড়ালেও বর্তমানে এই নাজুক অবস্থায় হুজুরগণ নিজেদের বিভেদ ভুলে এক টেবিলে বৈঠকে বসতে বাধ্য হলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় কি তা নির্ধারণ করা। অতি বৃদ্ধ একজন ব্যক্তি বয়সের জোরেই মজলিসের নেতৃত্ব পেয়ে গেলেন। অন্য সকল হুজুররাও তাকে হুজুর হুজুর করছিলো দেখে বোঝা গেলো সবার উপর তার একটা প্রভাব আছে। তিনিই আলোচনা শুরু করলেন। প্রায় নব্বই বছর বয়স তার। বয়সের ভারে কথার মধ্যে যতটুকু তৌতলামী আসে সেটা বজাই রেখে তিনি বললেন,

- চিরটাকাল নবী-রাসুলগণ কাফির-মুশরিক আর নাস্তিক-মুরতাদদের সাথে বিতর্ক করেছেন। আলেম-ওলামা মুফতি মুহাদ্দিসরাও বিতর্ক করেছেন। সেসব বিতর্কে কাফির-মুশরিকরাই পরাজিত হয়েছে আর মুমিনরা বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু আজ কেনো আমরা পরাজিত হচ্ছি? আমাদের মধ্যে কোনো ভুলত্রুটি নিশ্চয় ঘটেছে যে কারণে আল্লাহর নুসরত উঠে গিয়েছে।

এরপর তিনি মুফতি শারায়ত হোসেনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কৈফিয়ত তলব করে বললেন,

- সবার সামনে খুলে বলো তুমি কেনো বিতর্কে হেরে গেলে?

মুফতি শারায়ত আমতা আমতা করে বললেন,

- হযরত জী, প্রথমেই আমি একটা হাদিস বলতে চাই। হাদীস পাকে এসেছে, এক এলাকার লোকেরা একটা গাছকে পূজা করতো। এক ব্যক্তি ইচ্ছা করলো ঐ গাছটা কেটে ফেলবে তাই সে একটা কুড়াল নিয়ে রওয়ানা হলো। গাছটি কেটে ফেলা হচ্ছে দেখে ইবলিস শয়তান চিন্তিত হয়ে পড়লো। শেষে ইবলিস শয়তান ঐ লোকটির

কাছে গিয়ে বলল, তুমি যদি ফিরে যাও তবে প্রতিদিন তুমি তোমার বালিশের নিচে একটি করে দীনার পাবে। এটা শুনে ঐ ব্যক্তি ফিরে গেলো এবং প্রথম দিন বালিশের নিচে একটি দীনার পেলো। পরের দিন কিন্তু আর কোনো দীনার সে পেলো না। এতে রাগান্বিত হয়ে সে আবারো গাছটি কাটার জন্য রওনা হলে শয়তান তার গলা টিপে ধরে বলল, প্রথমদিন তোমার কাজে ইখলাস ছিলো তাই আমি তোমাকে বাধা দিতে পারিনি। কিন্তু আজ তুমি এসেছো টাকার লোভে তাই আমার কাছে আজ তুমি শক্তিহীন। এভাবে শয়তান তাকে পরাস্ত করে ফেলল।

কাহিনীটি বলার পর মুফতি সাহেব বেশ জোর গলাই বললেন,

- সম্মানিত উপস্থিতি, ঐ বুড়ো নাস্তিক সাক্ষাত শয়তানের মতোই কাজ করেছে। বিতর্কের আগেই মাদ্রাসার এতীমদের উদ্দেশ্যে একটা মোটা সোটা ছাগল পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি হুজুর মানুষ। অমন সুন্দর ছাগল দেখে কিভাবে ধৈর্য ধরে থাকি! লোভে পড়ে ঐ ছাগলের মাংস খেয়েছিলাম। এভাবে এতীমের সম্পদ হারামভাবে ভক্ষণ

করার কারণেই হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার পরাজয় লিখিত হয়ে গেছে। অতএব এতে আমার কোনো দোষ নেই বরং ঐ বুড়ো নাস্তিকটারই দোষ।

কথাটা শুনে অন্য সকল হুজুররাও মুফতি সাহেবের মনের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারেন। এমন ঘটনা তাদের জীবনেও মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে। অতএব জোর গলাই কেউ এর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখেন না। তারপরও অতিবৃদ্ধ লোকটি ধমক দিয়ে বললেন,

- কমপক্ষে বিতর্কের আগ মুহূর্তে তুমি হারাম খাওয়া বন্ধ করতে পারতে।

পণ্ডিত ভাবাপন্ন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি আরও একটি দামী কথা বললেন। তিনি বললেন,

- এই ঘটনা প্রমাণ করে হারাম খাওয়ার কারণেই বিতর্কে আমাদের পরাজয় হয়েছে। অতএব এখন আমরা একটা হালাল খাওয়া মুফতি খুঁজে বের করে নাস্তিকদের সাথে আরও একবার বিতর্কের আয়োজন করবো। আশা করা যায় তাতেই আমাদের বিজয় হবে।

এই কথাটা মজলিসের সবাই একবাক্যে সমর্থন করলো।

কিন্তু কথায় বলে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে? আগামী বিতর্কে অংশগ্রহণের মতো কোনো মুফতি খুঁজে পাওয়া তেমনই কষ্টকর হলো। অবস্থা হলো, ঐ মহিলার মতো, যে এলাকার যুবকদের সাথে অনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে বিধায় তাকে এলাকাছাড়া করার জন্য সমাজপতিরা একটা মিটিং ডাকে। ঐ মিটিং-এ ঐ মহিলা বলে,

- আমি যে অন্যায় কাজ করি তার বিচার তো অবশ্যই হওয়া উচিত। কিন্তু আমার বিচার সেই মাতব্বর করবে যে আমার কাছে যাতায়াত করেনি।

মহিলার দাবীটি অত্যন্ত যৌক্তিক। তাই জনগণ তাতে সমর্থন জানালো। কিন্তু তারপরই মহা মুসিবত দেখা গেলো। দেখা গেলো, মহিলার বিচার করতে কোনো মাতব্বরই অগ্রসর হচ্ছে না। বোঝা গেলো, তাদের সবাই তার কাছে যাতায়াত করে। এতগুলো হুজুরের মধ্যে তাই হালাল খাওয়া হুজুর খুঁজে পাওয়া গেলো না। অর্থাৎ তারা সবাই আসলে হারাম খোর। এমনকি খোদ বুড় হুজুরও সাহস করে বিতর্কের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারলেন না। সারাটা জীবন বিভিন্ন মাদ্রাসায় মুহতামিমের দায়িত্ব পালন

করেছেন। কত গরু ছাগল তার সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করেছে। তার কোনোটি তার অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে তিনি মনে করতে পারেন না। অতএব হারাম খাওয়াই যদি বিতর্কে হেরে যাওয়ার একমাত্র কারণ হয় তবে তিনি এ বিতর্কে হেরেই যাবেন। এভাবে এই একমাত্র সমাধানটি বানচাল হয়ে গেলো। বুড়ো হুজুর তখন একটি ভিন্ন প্রস্তাবনা মজলিসে উত্থাপন করলেন। সব মাদ্রাসার এতীম ছাত্রদের একটি খোলা ময়দানে হাজির হতে বললেন। ঐ সব এতীমখানার দায়িত্বশীল শিক্ষকদেরও হাজির করলেন। তারপর সবাই মিলে দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন,

- প্রভু হে, আমরা পাপী-তাপী গোনাগার মানুষ। এতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করি। কিন্তু এই সব এতীম ছেলেরা তো আর কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে না? তারা তো আর আমাদের মতো পাপী নয়। তাদের হাতের ওসীলাতে হলেও তুমি এই নাজুক অবস্থা থেকে গোটা আলেম সমাজকে মুক্তি দাও। ঐ বুড়ো নাস্তিককে বিতর্কে পরাজিত করতে পারে তুমি এই জামানায় এমন কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটান।

আট.

মুজিবুল হকের জমিদার বাড়িটি এলাকার অন্যান্য বাড়ির চেয়ে বেশ উঁচু। এর ছাদে উঠলে প্রায় পুরা এলাকাটা চোখে পড়ে। আসেপাশের বাড়িগুলোতে কুদৃষ্টি দেওয়ার জন্য তার নাতি-নাতনীরা প্রায়ই ছাদে ওঠে। মুজিবুল হক নিজেও মাঝে মাঝেই ছাদে উঠে বসে থাকেন। তবে সেটা ঐ উদ্দেশ্যে নয় বরং মুক্ত বায়ু সেবন করার জন্য। আজ ছাদে উঠেই তিনি হকচকিয়ে গেলেন। দেখলেন, রিয়াদ ছাদে একটা বড় টেলিস্কোপ বাসিয়ে আকাশের দিকে তাক করে মোহিত হয়ে কি যেনো দেখছে। টেলিস্কোপটা সে কোথায় পেলো এই প্রশ্ন প্রথমেই তার মনে উদয় হলো খুব সহজে তার উত্তরও পেয়ে গেলেন। ভাতা বাবদ যে টাকা তিনি নাতি-নাতনীদের প্রদান করেন অন্যরা তা বাজে কাজে ব্যবহার করলেও রিয়াদ সেগুলো কেবলই গঠনমূলক কাজে খরচ করে। নানা রকম বই-পুস্তক কেনা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার জন্য ছোট খাট যন্ত্রপাতি কেনা তার শখ। মুজিবুল হক নিজেই তাকে এসব কাজে উৎসাহিত করেন। তার বিশ্বাস বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি ধর্মের কুসংস্কারে

আটকিয়ে থাকে না। তাই তিনি নাতি-নাতনীদের বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। অন্য সবার ক্ষেত্রে তার এই চেষ্টা ব্যর্থ হলেও রিয়াদ যে এই শিক্ষাকে বুকে ধারণ করেছে তা ভেবে তিনি গর্ববোধ করেন। তাই তো তিনি তাকে এতটা ভাল বাসেন। মনে মনে তিনি কামনা করেন, সে যেনো এমন কিছু আবিষ্কার করতে পারে যা যুগের স্রোতকে পাল্টে দেবে। এখন টেলিস্কোপের উপর হাটু গেড়ে পড়ে থাকতে দেখে মুজিবুল হকের সেই কামনাটা আবারো মনের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। সে কি করছে এ বিষয়ে তার ভীষণ কৌতুহল হয়। কিন্তু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন না। তার মতে, একজন বিজ্ঞানীর ধ্যান ভঙ্গ করা কোনো সাধু সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ করার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। কারণ বিজ্ঞানের গবেষণা মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। আর সাধু সন্ন্যাসীদের ধ্যান কেবলই অন্ধত্ব আর কুসংস্কারের জন্ম দেয়। অতএব তিনি রিয়াদকে বিরক্ত না করে পা টিপে টিপে ছাদ থেকে নেমে যান।

এরপর যখনই তিনি ছাদে যান তখনই রিয়াদকে সেই একই অবস্থায় দেখেন। মনে মনে ভাবেন,

- ছেলেটা নাওয়া খাওয়া ভুলে কি নিয়ে এতো গবেষণা
করছে?

মনে মনে বেশ কৌতুহলী হয়ে ওঠে মুজিবুল হক। কিন্তু
তার সেই একই কথা।

- বিজ্ঞানীদের ধ্যান ভঙ্গ করা যাবে না।

তবে কথাই বলে, ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে। বেশ কিছু
দিন অতিবাহিত হলে দাদাজান তাই অধিক কৌতুহলে
অধৈর্য হয়ে উঠলেন। শেষে একদিন সন্ধ্যা বেলা ছাদে
গিয়ে রিয়াদের ধ্যান ভঙ্গ করে বললেন,

- কিহে, রিয়াদবাবু। কদিন ধরে আকাশে কি এমন
জিনিস খুঁজছো?

রিয়াদ যেনো দাদুর প্রশ্নের অপেক্ষায়ই ছিলো। টেলিস্কোপ
থেকে মুখ না তুলে সাথে সাথেই বলল,

- সে খুব রহস্যময় একটা জিনিস খুঁজছি দাদু।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো রিয়াদের কথাটা যেনো
দাদুর কৌতুহলকে উসকে দিলো। তিনি আরো বেশি
আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বললেন,

- সেটা কি?

এবার টেলিস্কোপ থেকে মুখ সরিয়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে
মুচকি হেসে রিয়াদ বলল,

- স্রষ্টা!

কথাটা শুনে দাদার বুকটা যেনো ধপ করে উঠলো।

- স্রষ্টা!

স্বাভাবিকভাবে রিয়াদ আবারো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

- হু। স্রষ্টা।

কয়েক সেকেন্ড দাদুর মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না।
তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,

- অযৌক্তিক

রিয়াদ অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলল,

- অযৌক্তিক কেনো হবে?

দাদু বিরক্ত ভরা কণ্ঠে বললেন,

- যা নেই তা খুঁজে বেড়ানো অযৌক্তিক নয়?

- কি নেই?

- স্রষ্টা।

- তুমি নিশ্চিত?

মুজিবুল হক এবার দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,

- শতভাগ নিশ্চিত।

মুচকি হেসে রিয়াদ বলে,

- এত নিশ্চিত কিভাবে হলে? এ ব্যাপারে তোমার যুক্তি কি?

কিছুমাত্র বিলম্ব না করে মুজিবুল হক উত্তর দিলেন,

- স্রষ্টাকে কি দেখা যায়? যাকে দেখা যায় না তাকে মানবো কেনো? থাকলে তাকে অবশ্যই আমরা দেখতে পেতাম।

রিয়াদ হুবহু এই উত্তরটিই আশা করেছিলো। সে জানে স্রষ্টাকে অস্বীকার করার ব্যাপারে দুনিয়ার সকল নাস্তিকরাই এই একটিমাত্র যুক্তিই ব্যবহার করে। উত্তরটা শুনে মুচকি হেসে সে বলে,

- দাদু, এই টেলিস্কোপে একটু চোখ রাখো তো।

কথাটা শুনে মুজিবুল হক যেনো শিউরে উঠলেন। রিয়াদ কি তবে সত্যি সত্যিই স্রষ্টাকে খুঁজে পেয়েছে! টেলিস্কোপে চোখ রাখার সাথে সাথেই কি মুজিবুল হক নিজেও তাকে দেখতে পারে! তবে তো তার সারাজীবনের নাস্তিকতাটাই ভুল প্রমাণিত হবে। কি সর্বনাশ! ভয়ে ভয়ে তিনি টেলিস্কোপে চোখ রাখলেন। কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেলেন না। আশ্বস্ত হয়ে বললেন,

- কই? আমি তো কিছুই দেখছি না!

রিয়াদ অবাক হয়ে বলে,

- কিছুই দেখছো না?

- উহ্। কিছু না।

রিয়াদ রসিকতা করে বলে,

- তবে তো ভাল ডাক্তারের কাছে তোমার চোখের চিকিৎসা করানো দরকার। তারা ভরা চাঁদনী রাতে টেলিস্কোপে চোখ রেখেও তুমি যদি গ্রহ নক্ষত্র কিছুই দেখতে না পাও তবে তো বেশ চিন্তার কথা।

মুজিবুল হক যেনো ধাঁধায় পড়ে গেলেন,

- আরে! গ্রহ নক্ষত্র তো দেখছি কিন্তু স্রষ্টাকে তো কোথাও দেখছি না।

রিয়াদ এবার হো হো করে হেসে ফেললো,

- স্রষ্টাকে কি এভাবে দেখা যায়? আমি তো তোমাকে ঐ গ্রহ নক্ষত্রই দেখতে বলছি।

মুজিবুল হক এবার প্রশান্ত মনে টেলিস্কোপে চোখ বুলাতে বুলাতে বললেন,

- হুম। তাই বল।

টেলিস্কোপে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র আর বিচিত্র সব জিনিস দেখে তার মনটা আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে কবিতা বের হয়ে আসে।

আকাশের বুকে কি রূপের বাহার

এসব দেখে মন জুড়ায় আমার

দুটি লাইন বেশ সহজেই মিলে যায়। কিন্তু এরপর আর মেলাতে পারেন না। প্রায়ই তার এমন হয়। কবিতা শুরু

হয় কিন্তু শেষ হয় না। বিরক্ত হয়ে শেষে তিনি টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। রিয়াদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

- তুই যে বললি স্রষ্টাকে খুঁজছি।

মুচকি হেসে রিয়াদ বলে,

- রসিকতা করেছি।

- তাহলে আসলে কি খুঁজছিস?

- এলিয়েন।

মুজিবুল হক এবার ভীষণ খুশি হলেন। এই না হলে তার নাতি। এতক্ষণ তার মনে হয়েছিলো ছেলোটো বুঝি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তাই ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার সে বেশ উঁচু স্তরের বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। এলিয়েন তথা ভীন গ্রহের প্রাণীই হলো আধুনিক যুগের গবেষণার বিষয়। রিয়াদের প্রশংসায় তাই তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। পিঠে চাপড় মেরে বললেন,

- বাহ! বাহ! চমৎকার একটা গবেষণা।

রিয়াদ নিজের মুখটা পাংশু করে বলে,

- কিন্তু দাদু এলিয়েন কি সত্যিই আছে?

কিছুক্ষণ নিরব থেকে মুজিবুল হক বলেন,

- কেউ তো আর তাদের দেখেনি। তাই আছে কিনা সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে কেউ দেখেনি মানেই তো আর এমন নয় যে তারা নেই। মহাবিশ্বটা কি আর ছোট একটা চিড়িয়াখানা! বহু দূরের কোনো গ্রহে কোনো এলিয়েন থাকলেও থাকতে পারে। তাই তো এখন বিজ্ঞানীরা তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রিয়াদ বিড়বিড় করে বলে,

- দেখেনি মানেই তো আর এমন নয় তারা নেই। থাকলে থাকতেও পারে। তাই না?

কথাটা রিয়াদ বুঝতে পেরেছে দেখে দাদু ভীষণ খুশি হলেন।

- একেবারে ঠিক কথা। পাকা বিজ্ঞানীর মতো কথা।

হঠাৎ দাদুর চোখের উপর চোখ রেখে রিয়াদ বলে,

- কেবল স্রষ্টার ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। তাই তো?

আবারো স্রষ্টার নাম শুনে দাদু যেনো শক খেলেন,

- মানে?

দাদুর চোখের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই রিয়াদ বলে,

- স্রষ্টার ক্ষেত্রে তুমি বললে, কেউ দেখেনি তাই নিশ্চিতভাবেই তার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এলিয়েনের ক্ষেত্রে বলছো কেউ দেখেনি তাতে কি? সবার অলক্ষ্যে তাদের অস্তিত্ব তো থাকতেও পারে। বিষয়টা দ্বিমুখী হয়ে গেলো না? এমনও তো হতে পারে যে স্রষ্টাকে কেউ দেখেনি বটে তবু তিনি আছেন। সবার অলক্ষ্যে দূরে কোথাও তিনি অবস্থান করছেন। তবে নাস্তিকরা কেবল কেউ দেখেনি এই যুক্তিতে তাকে অস্বীকার করছে কেনো?

কথাটা মুজিবুল হকের বুকটা ফেঁড়ে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে গেলো। কিছুক্ষণ নিরব থেকে তিনি চিন্তা করে নিলেন। তিনি একজন নাস্তিক। আর নাস্তিকতার মূলমন্ত্রই হলো স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজেও সারাটা জীবন ধরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এসেছেন। স্রষ্টা নেই, স্রষ্টা নেই

বলে যিকির করে বেড়িয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন কেবল স্রষ্টাকে দেখা যায় না এই যুক্তিটিই নাস্তিকদের একমাত্র যুক্তি। এর উপর ভিত্তি করেই তারা নিশ্চিতভাবে দাবী করে স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। তার কাছেও যুক্তিটা এতদিন অব্যর্থ মনে হয়েছে। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে যুক্তিটার মধ্যে বড় রকমের ফাঁক ফোঁকড় রয়েছে। করুন স্বরে তিনি বলেন,

- তুই কি বলতে চাস?

রিয়াদ নরম স্বরে বলে,

- আমি বলতে চাই কেউ দেখেনি এই যুক্তিতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে অস্বীকার করা অযৌক্তিক। এর উপর নির্ভর করে বড় জোর সন্দেহ করা যায়। যেমন বলা যায়, এলিয়েন আমরা দেখিনি। তাই এলিয়েন আছে কিনা আমরা নিশ্চিত নই। থাকলে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। তোমরাও বলতে পারো স্রষ্টাকে আমরা দেখিনি। তাই স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। থাকলে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।

রিয়াদের যুক্তিটা দাদাজান ধরতে পারেন। মাথাটা বার কয়েক ঝাকিয়ে বলেন,

- কথা তো ঠিক। কিন্তু এতে তো আমার নাস্তিকতাই ভুঁল হয়ে যাবে।

রিয়াদ তাকে অভয় দিয়ে বলে,

- দেখো, যুক্তির অবাধ্য হয়েও নাস্তিকাতাকে মেনে চলতে হবে এটা অন্ধত্ব হয়ে যায়। তাছাড়া স্রষ্টার অস্তিত্বে সন্দেহ করলেই তো আর তুমি মুমিন-মুসলমান হয়ে যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রেও মোল্লারা তোমাকে নাস্তিকই বলবে।

নিজের অজান্তেই মুজিবুল হক বিড়বিড় করে বলেন,

- তা বটে, তা বটে।

এর পর থেকে দাদাজানের বক্তব্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আসলো। তিনি বলতে শুরু করলেন,

- আমরা স্রষ্টাকে দেখি না। একারণে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে তার অস্তিত্ব নেই। যেহেতু আমাদের অজ্ঞাতে অনেক কিছুই থাকতে পারে। তবে যেহেতু আমরা স্বচোক্ষে তাকে দেখিনি তাই আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত

নই বরং সন্দেহে রয়েছে। এই সন্দেহকেও নাস্তিকতা বলা যায়। যেহেতু এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নয় তাই আমরা বিশ্বাসী নই বরং অবিশ্বাসীদের কাতারে পড়ি।

তার এই পরিবর্তন অন্য সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও আতিকের দৃষ্টি এড়াই না। সে রিয়াদের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে,

- গুরু, খেল তো দেখি শুরু।

রিয়াদ সাধু-সন্যাসীদের মতোই হাতটা উঁচু করে বলে,

- চুপ রহ বৎস। নইলে পুরা প্লানই ভস্ম হয়ে যাবে।

তার কথা শুনে আতিক নিরব হয়ে যায়। আবারো মুজিবুল হকের বক্তব্যের মধ্যে মনোনিবেশ করে ভিন্ন কোনো পরিবর্তন পাওয়া যায় কিনা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

নয়.

এই ঘটনার পর থেকে মুজিবুল হক যখনই ছাদে যান আড় চোখে একবার এদিক সেদিন তাকিয়ে নেন। টেলিস্কোপটির উপর চোখ পড়তেই তিনি চমকে

ওঠেন। যেনো মনে হয় কেউ তার বুকের উপর কামান ফিট করেছে। টেলিস্কোপে চোখ রাখতেও তিনি যেনো ভয় পান। মনে হয় যেনো স্বয়ং স্রষ্টা তার চোখের সামনে ভেসে উঠবেন। এভাবে অর্ধশত বছরের অধিক সময় ধরে তার অন্তরে পালিত নাস্তিকতা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। বার বার তিনি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। যুক্তির মানদণ্ডে যদি নাস্তিকতা ভুলই প্রমাণিত হয় তবে ক্ষতি কি? সত্যাস্থেষী হিসেবে সত্যকে জানতে পারাটাই কি আসল কৃতিত্ব নয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই বিষয়টি মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। একদিন ছাদে গিয়েই তিনি দেখলেন রিয়াদ টেলিস্কোপে চোখ দিয়ে পড়ে রয়েছে। প্রথমেই তিনি চমকে উঠলেন। ভাবলেন, স্রষ্টাকে খুঁজছে বোধ হয়। পরে তার মনে পড়ে গেলো, সে স্রষ্টাকে নয় এলিয়েনের খোঁজ করছে। স্বাভাবিক কণ্ঠে তাই তিনি বলেন,

- কিহে রিয়াদ বাবু এলিয়েনদের দেখা পেলেন?

বেশ খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করে রিয়াদ বলে,

- না। পেলাম না। ওরা যে কোথায় থাকে?

হি হি করে হেসে দাদু বললেন,

- কেবল টেলিস্কোপে কি আর ওদের হৃদিস পাওয়া যাবে।
এর জন্য দরকার দূর আকাশে তরঙ্গের মাধ্যমে বার্তা
পাঠানোর ব্যবস্থা। বিপরীতে তারা যদি কোনো বার্তা
পাঠায় তবে সেটা ধরার জন্যও দরকার শক্তিশালী
রিসিভার।

দাদার কথায় রিয়াদ যেনো উৎসাহী হয়ে ওঠে।

- ওসব কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে বলতে পারো?

মাথা নেড়ে দাদা বলেন,

- ওসব তো হাটে বাজারে পাওয়া যায় না। আর আমাদের
পক্ষে দাম দিয়ে তা কেনাও সম্ভব নয়। আমেরিকা বা
রাশিয়ার মতো বড় বড় রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের কাছে ওসব
যন্ত্র আছে। তারাই তো এলিয়েনের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা
করছে। আমাদের নতুন করে গবেষণা করার দরকার
কি?

রিয়াদ হতাশ হয়ে বলে,

- তাহলে, এলিয়েন আছে কিনা সে ব্যাপারে আমরা

কিভাবে নিশ্চিত হবো? তারা কোনো বার্তা পাঠালে আমরা
কিভাবে জানবো? আমাদের সন্দেহ কি তবে সন্দেহই
থেকে যাবে, কখনও নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হবে না?

দাদু হাসেন,

- পাগল ছেলে। সন্দেহ থেকে যাবে কেনো? যখন
বিজ্ঞানীরা এলিয়েনদের বার্তা পাবে তখন বিশ্বকে জানিয়ে
দেবে। এভাবে বিশ্বের লোকেরা এলিয়েনদের অস্তিত্ব
সম্পর্কে নিশ্চিত হবে?

দাদুর কথা শুনে রিয়াদ ভীষণ অবাক হলো,

- বিশ্বের লোকেরা অন্যের মুখে শুনেই এলিয়েনদের
অস্তিত্ব মেনে নেবে? নিজ চোখে দেখবেও না, নিজ কানে
তাদের বার্তাও শুনবে না এটা কেমন কথা!

রিয়াদের বোকামী দেখে দাদু যেনো পাঁটা বিস্ময় প্রকাশ
করেন,

- আরে পাগল। সবাই কি সব কিছু দেখতে বা শুনতে
পায়! অভিজ্ঞ জনেরা অধিক জ্ঞান গরিমা আর উন্নত
প্রযুক্তির কারণে এমন অনেক কিছুই দেখে যা আমরা
দেখি না। কোন রোগ কেনো হয়, কিভাবে তার প্রতিকার

করা যায়, আকাশের কোন তারকা কখন কোন গ্রহে
আছড়ে পড়বে ইত্যাদি কত শত খবরাখবর বিজ্ঞানীরা
গবেষণা করে আমাদের শুনান। আমরা নিজেরা না বুঝেই
তাদের কথা মেনে নিই। এভাবে এলিয়েনরা যদি সত্যিই
বার্তা পাঠায় আর বিজ্ঞানীরা তা ধরতে পারেন আর
মানুষকে তা জানিয়ে দেন তবে আমরা নিশ্চিত হবো যে
এলিয়েনের অস্তিত্ব আছে। সবগুলো বিজ্ঞানী তো আর
এক সাথে মিথ্যা কথা বলবে না।

রিয়াদ নাছোড় বান্দা। জিদ ধরে বলে,

- আমি যদি বলি, আমি চোখে না দেখা পর্যন্ত বা স্বয়ং
আমার কাছে বার্তা না পাঠানো পর্যন্ত আমি এলিয়েনদের
অস্তিত্ব মানবো না?

দাদু একটু বিরক্ত হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন,

- আহা সেটা বললে তো গোড়ামী হয়ে যাবে। তুমি এমন
কে যে, সরাসরি তোমার কাছেই বার্তা পাঠাতে হবে?
তাছাড়া বার্তা পাঠালেও সে তরঙ্গ ধরতে পারার মতো
রিসিভার বা সেটা বোঝার মতো জ্ঞান তোমার আছে কি?
অতএব, এলিয়েনরা যদি কিছু জ্ঞানী গুনি লোকের কাছে

বার্তা পাঠায় তবে তার উপর নির্ভর করে তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাটাই যুক্তির দাবী। আমিই দেখবো বা আমিই শুনবো এমন বলা গোড়ামী।

টেলিস্কোপ থেকে চোখ ফিরিয়ে হঠাৎ দাদুর দিকে দৃষ্টি ফেলে রিয়াদ বলে,

- স্রষ্টা নিজে যদি এমন কোনো বার্তা কোনো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির নিকট পাঠান আর তিনি সারা বিশ্বের মানুষের নিকট প্রচার করে দেন তবে বিশ্বের মানুষের পক্ষে কোনটি যৌক্তিক হবে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা নাকি আমি নিজে না দেখা পর্যন্ত বা স্বয়ং আমার নিকট বার্তা না পাঠানো পর্যন্ত আমি স্রষ্টাকে মানবো না এমন বলা?

মুজিবুল হকের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠলো। রিয়াদ আবাবো তাকে মহা ফাঁপড়ে ফেলে দিয়েছে। এতদিন তো তার স্লেগানই ছিলো, স্রষ্টাকে নিজের চোখে না দেখে বা নিজের কানে তার কথা না শুনে তাকে মানবো না। কিন্তু কি আশ্চর্য এখন তো মনে হচ্ছে এই কথা সুস্পষ্ট গোড়ামী ছাড়া কিছু নয়। এলিয়েনের ক্ষেত্রে তিনি নিজেই যে বয়ান রিয়াদকে এতক্ষণ শোনাচ্ছিলেন সে কথা স্রষ্টার উপর প্রয়োগ করলেই তো বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিছু

লোক দেখলে বা কিছু লোকের কাছে বার্তা পাঠালেই তো
স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু এমন বার্তা কি
আদৌ এসেছে? আমতা আমতা করে তিনি বলেন,

- স্রষ্টা কি তবে কোনো বার্তা পাঠিয়েছেন?

- কোনো নয় দাদু। এমন বার্তা তিনি ঘনো ঘনো
পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে নানা জনে নিজেকে নবী দাবী
করেছে এবং স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাদের নিকট বার্তা আসে
এমন দাবী করেছে। ইব্রাহীম, ইসমাইল, ইয়াকুব,
ইউসুফ, ইউনুস, ঈসা, মুসা এবং শেষ নবী হযরত
মুহাম্মদ (সঃ) এরা সবাই এমন দাবীই করেছেন। ঠিক
কিনা?

মুজিবুল হক একটু ভেবে নিয়ে বলেন,

- এসব ঘটনা তো মিথ্যাও হতে পারে তাই না?

কথাটা শুনে রিয়াদের ভিতরটা রাগে জ্বলে ওঠে কিন্তু
জোর করে রাগ সংবরণ করে সে বলে,

- কোনটাকে তুমি মিথ্যা বলতে চাও? চিন্তা করে বলো
তো। যুগে যুগে কিছু লোক যে নবুয়ত তথা স্রষ্টার বার্তা
পাওয়ার দাবী করেছিলো এই ঘটনাটাই মিথ্যা নাকি তুমি

বলতে চাও কিছুলোক স্রষ্টার বার্তা পাওয়ার দাবী করেছিলো এটা সত্য কিন্তু যারা দাবী করেছিলো তারা আসলে মিথ্যা দাবী করেছিলো?

দাদু একটু ভেবে নিয়ে বলেন,

- ইতিহাসে কিছু লোক যে স্রষ্টার পক্ষ থেকে বার্তা পাওয়ার দাবী করেছে এটা নিঃসন্দেহে সত্য। ইতিহাস ঘাটলে এর স্বপক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এটা অস্বীকার করার উপাই নেই। কিন্তু আমাদের কথা হলো তারা সবাই মিথ্যা বলেছিলো। আসলে তাদের নিকট কোনো বার্তা আসেনি।

হালকাভাবে মাথা নেড়ে রিয়াদ বলে,

- তবে দাদু ইচ্ছা হলেই কিন্তু কাউকে মিথ্যাবাদী বলা যায় না। কেনো মিথ্যাবাদী বলছি তার কারণ থাকা লাগে। সাধারনত তিনটি কারণে কাউকে মিথ্যাবাদী বলা হয়, এক. হয়তো সে এমনিতেই ঠগ ও বাটপার হিসেবে সমাজে প্রচলিত থাকবে, দুই. হয়তো সে যে বিষয়ের দাবী করছে তা অসম্ভব ও অবাস্তব বিষয় হবে, তিন. মিথ্যা দাবী করে তার কোনো স্বার্থ হাসিলের প্লান

থাকবে। নবীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এর কোনোটিই খাটে না।
 প্রথমত প্রতিটি নবীই নবুয়তের দাবী করার আগে এবং
 পরে বিশ্বস্ত ও আমানতদার ব্যক্তি হিসেবেই পরিচিত
 ছিলেন। এমনকি মুহাম্মদ ﷺ কে তো নবী হওয়ার আগেই
 কাফিররা আল-আমীন তথা পরম বিশ্বস্ত নামে আখ্যায়িত
 করেছিলো। দ্বিতীয়ত আমরা আগে থেকেই জানি স্রষ্টা
 বলে কেউ একজন থাকতে পারে। ফলে তার পক্ষ থেকে
 কোনো বার্তা আসলেও আসতে পারে অতএব নবীগণ যে
 দাবী করেছেন তা অযৌক্তিক বা অসম্ভব কোনো দাবী
 নয়। বরং সেটাই স্বাভাবিক যুক্তির দাবী। তৃতীয়তঃ
 নবুয়ত দাবী করে নবীরা কোনো স্বার্থ হাসিল করেননি।
 উল্টো বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রায়
 প্রতিটি নবীই নবুয়ত দাবী করার কারণে কাফির-
 মুশরিকদের হাতে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়েছেন। প্রশ্ন
 হলো, পূর্বের নবীদের লাঞ্চিত ও অপমানিত হতে দেখেও
 পরের নবীরা আবারো কোন স্বার্থে নবুয়তের দাবী
 করেছেন? বোঝা যায় স্বার্থ নয় বরং মহান রবের পক্ষ
 থেকে আদিষ্ট হয়েই তারা এমন দাবী করেছেন।
 এরপরও আপনি কেনো বলবেন, তারা মিথ্যা বলেছেন?
 কেবল গোড়ামীর বশবর্তী হয়েই কি? একদল উদভ্রান্ত ও

আত্মভোলা বিজ্ঞানী কিছু বললে সেটা আপনি নির্বাক্যে মেনে নিচ্ছেন কিন্তু এতগুলো উত্তম ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তির কথাকে বিনাবাক্যে ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন। বিষয়টা যুক্তিবিরুদ্ধ নয় কি?

মুজিবুল হক যেনো বাকরুদ্ধ হয়ে যান। তাই তো! যুগে যুগে যেসব নবী-রাসুল এসেছেন তাদের সবাইকে এক যোগে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করাটা সত্যিই অযৌক্তিক মনে হচ্ছে। তারা তো অসং লোক ছিলেন না এবং নবুয়তের দাবীতে তাদের কোনো স্বার্থও ছিলো না। উল্টো অপমানি ও লাঞ্ছনা ছিলো। কি কারণে তারা এসব সহ্য করেছেন? তবে কি সত্যিই তারা মহান রবের পক্ষ থেকে বার্তা পেয়েছিলেন? সত্য যখন কেউ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তখনই সে সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য তৈরী হয়ে যায়। নবীদের জীবনী ঘটলে এটা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে তারা কিছু একটা অনুভব করেছেন। আর সারাটা জীবন তারই পিছনে ছুটে বেড়িয়েছেন। তবে কি সত্যিই তারা পেয়েছিলেন রবের বার্তা? এ ছাড়া ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা তো কিছুতেই মেলাতো যাচ্ছে না।

নিজের মাথাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে মুজিবুল হক

একটা চেয়ারের উপর থপ করে বসে পড়েন। অবস্থা বেগতিক দেখে রিয়াদ নিরবে প্রস্থান করে।

দশ.

এই ঘটনার পর থেকে মুজিবুল হক বেশ কিছুদিন আপন মনে রিয়াদের কথগুলো নিয়ে ভাবতে থাকেন। মনে মনে তিনি নাস্তিকতার ভিত্তিকে শক্ত করার জন্য যুক্তি প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সন্তোষজনক যুক্তি-প্রমাণ খুঁজে পেলেন না। ভীষণ অবাক হয়ে তিনি ভাবেন,

- কি আশ্চর্য! সারাটা জীবন ধরে নাস্তিকতার চর্চা করছি অথচ এখন আমি স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মতো যৌক্তিক কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। উল্টো স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষেই নানা দলীল-প্রমাণ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই সৃষ্টি জগৎ নিজেই একজন স্রষ্টার উপস্থিতির স্বাক্ষ্য বহন করছে। জোর করে সেটাকে এতদিন ধামাচাপা দিয়েছি। যুগে যুগে কিছু উত্তম ও উৎকৃষ্ট মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বের ঘোষণা দিয়ে গেছেন। তাদের এক বাক্যে মিথ্যাবাদী বলেছি। এর বিপরীতে

আমার হাতে কি এমন শক্ত দলীল আছে যার উপর নির্ভর করা যায়!

মুজিবুল হক নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাতটি খুলে দেখলেন সেটা সম্পূর্ণ শূন্য। সেখানে কিছুই নেই। তবে কি নাস্তিকতাটাই আসলে ভুল! এই মুহূর্তে এটাই তার নিকট সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হচ্ছে। সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। তবে কি তিনি শেষে একজন ধর্মান্ধ মোল্লায় পরিণত হবেন। মনে মনে রিয়াদের উপর খুব রাগ হয় তার। তারই খেয়ে তারই পরে সে কিনা এখন তাকেই নাস্তিকতা থেকে ফিরিয়ে ধর্মান্ধ বানিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। তার এই চেষ্টাকে যে কোনো মূল্যে বিফল করে দিতে হবে। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন মুজিবুল হক। কিন্তু কোনো উপায় খুঁজে পান না তিনি।

হঠাৎ তার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। যে অস্ত্রে তিনি মোল্লাদের তর্কে হারিয়ে দিয়েছেন সেই অস্ত্রটি তো এখনও বহাল তবীয়তেই টিকে আছে। রিয়াদের উপরে তিনি সেই অস্ত্রই প্রয়োগ করবেন। প্রমাণ করে দেবেন, কুরআন যদি স্রষ্টার বার্তাও হয় তবুও তাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। এভাবে হয়তো তার নিজের নাস্তিকতাও

রক্ষা পাবে আর ছেলেটাকেও আবারো নাস্তিকতায় ফিরিয়ে আনা যাবে। হতাশার পর হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেলে মানুষ যেমন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় তার অবস্থা অনেকটা সেরকমই হলো। রিয়াদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তাকে খুজতে থাকেন তিনি। সভাকক্ষে বেশ কিছু ছেলে-পিলের মাঝে রিয়াদকে পেয়েই তাকে চেপে ধরলেন,

- তুমি বলতে চাও কুরআনই স্রষ্টার বার্তা আর ইসলাম ধর্মই স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য ধর্ম?

রিয়াদ কিন্তু এমন প্রশ্নের জন্য আদৌ তৈরী ছিলো না। দাদাজান যে বিষয়টি ভরা মজলিসে আলোচনা করবেন তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। থতমত খেয়ে সে বলে,

- জী হ্যাঁ।

উপস্থিত সবাই ভীষণ অবাক হয়। তারা সবাই এতদিন জানতো রিয়াদ দাদাজানের একান্ত অনুগত অনুসারী। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দুজন দুই প্রান্তের লোক। কবে কখন কিভাবে এত পরিবর্তন রিয়াদের মধ্যে এসেছে সেটা নিয়ে তারা গবেষণা করতে লাগলো। ইতোমধ্যে

দাদাজানের মধ্যে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেটা অবশ্য
কেউ ধরতে পারলো না।

তখনই দাদুর গলা শোনা গেলো,

- এসো তবে তোমার সাথে আমার বিতর্ক হবে।

কথাটা শুনে রিয়াদ কিছুটা নাখোশ হয়। সে চাচ্ছিলো
বিষয়গুলো নিয়ে দাদার সাথে নির্জনে আলোচনা করতে,
প্রকাশ্য সমাবেশে নয়। যেহেতু নির্জনে কারো কোনো
ভুল ধরিয়ে দিলে তার জন্য শুধরে নেওয়া সহজ হয় কিন্তু
প্রকাশ্য সমাবেশে কারো ভুল ধরিয়ে দিলে তার পক্ষে
মেনে নেওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু এখন অবস্থা যা
দাড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে প্রকাশ্য সমাবেশেই বিতর্ক
করতে সে বাধ্য হবে। সে মনে মনে হাসে দাদু ভেবেছেন
সেদিন মুফতি সাহেবকে যেভাবে ঘায়েল করেছেন আজ
জনসম্মুখে রিয়াদকে আরেকবার ঘায়েল করে দিয়ে
বাহবা অর্জন করবেন। কিন্তু বিতর্কে কে ঘায়েল হবে
সেটা রিয়াদ আগে থেকেই জানে। তাই বিতর্কের ব্যাপারে
বিন্দুমাত্র ভয় ডর তার অন্তরে নেই। আবার বিতর্কের
যেহেতু অনেক কুপ্রভাব আছে তাই এ ব্যাপারে সে খুব
একটা উৎসাহও বোধ করে না। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য

বলে,

- আবার বিতর্ক কেনো?

দাদু গর্ব ভরে বলে ওঠেন,

- পালাবার উপায় নেই রিয়াদ বাবু। বিতর্ক তোমাকে করতেই হবে।

রিয়াদ বুঝলো দাদু নাছোড়বান্দা। বিতর্ক তাকে করতেই হবে। ঠিক আছে তা না হয় হবে কিন্তু তার জন্য তো আরেকটু সময় দরকার। এখনও কিছুটা প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। আনুরোধের স্বরে তাই সে বলে,

- তাহলে আমাকে কটা দিন সময় দিন।

মুজিবুল হক মাথা নাড়েন। রিয়াদের লজিকের উপর তার বেশ আস্থা আছে। কটা দিন সময় দিলে কোন দিকের পানি কোন দিকে গড়ায় তার ঠিক নেই। তাই তো তিনি আজ তাকে হঠাৎ পাকড়াও করেছেন। এখন সময় দিয়ে ফাঁদে পড়া শিকারকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। তিনি হুংকার ছেড়ে বললেন,

- তোমাকে আজ এবং এখনই আমার সাথে বিতর্ক

করতে হবে। এখানে অনেক নতুন নাস্তিকও আছে তারা দেখবে কমরেড মুজিবুল হক কি জিনিস। নিজের নাতিকেও ছেড়ে কথা বলে না।

অগত্যা কি আর করা রিয়াদ রাজি হয়ে যায়। গলার স্বর নরম করে বলে,

- ঠিক আছে আমি রাজি তবে একটা শর্ত আছে?

মুজিবুল হক কোতুহলী হয়ে বলেন,

- কি শর্ত?

- হেরে গেলে তওবা করে নাস্তিকতা থেকে ফিরে আসতে হবে।

মুজিবুল হক যেনো বিশাল দোটানায় পড়ে গেলেন। রিয়াদ যে তাকে হারাতে পারবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। যেসব প্রশ্নের উত্তর মাদ্রাসার বড় মুফতিরাই দিতে পারেনি সে প্রশ্নের উত্তর রিয়াদ কিভাবে দেবে! কিন্তু তবু যেনো কিসের একটা খটকা তার মনের মাঝে খুত খুত করতে থাকে। একটু ভেবে শেষে তিনি বলে ওঠেন,

- ঠিক আছে হেরে গেলে আমি তওবা করবো। নাস্তিকতা ছেড়ে মোল্লা হয়ে যাবো।

কথাটা শুনে রিয়াদ বিতর্কে সম্মতি জানালো। আর সাথে সাথেই বিতর্কের আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। সভাকক্ষে একটা টেবিল হাজির করা হলো আর তার দুই পাশে দুটি চেয়ার ফিট করে মঞ্চ তৈরী করা হলো। সবাই যখন এসব কাজে ব্যস্ত তখন আতিক এসে রিয়াদের কানে কানে ফিস ফিস করে বলে,

- কি গুরু পারবে তো? দেখো কিন্তু।

রিয়াদ এমন ভাব করে যেনো এটা কোনো ব্যাপারই না। আতিক আবারো তাকে সতর্ক করে।

- যেখানে মাদ্রাসার মুফতিরাই হেরে গেলো সেখানে তুমি কিভাবে যে বিজয়ী হবে বুঝতে পারছি না।

রিয়াদ তাকে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করে,

- হুজুররা হকের সাথে বাতিলকে মিশিয়ে ফেলেছে তাই বাতিলের সাথে বিতর্কে হেরে গেছে। পরিপূর্ণভাবে হকের উপর টিকে থাকলে বাতিলের সাথে বিতর্কে কখনও তারা পরাজিত হতো না। ঘটনা হয়েছে ঐ ছাগলের মতো যার

শরীরটা একটু হালকা পাতলা হলেও সুচালু দুটো শিঙ ছিলো। তাই অন্যান্য ছাগলরা তার সাথে লড়াইয়ে পেরে উঠতো না। এভাবে সে সকলের উপর কর্তৃত্ব করতো। শেষে তারা তাকে বোঝালো, দেখো শিঙ ছাড়া আমাদের কত সুন্দর লাগছে। তোমারও উচিৎ শিঙদুটো ভেঙে ফেলা। তাদের কথা শুনে সে পাথরে আঘাত করে নিজের শিঙদুটি ভেঙে ফেলল। তারপরই শুরু হলো আসল খেলা। অন্য ছাগলগুলো এতদিনের অপমানের প্রতিষোধ নেওয়ার সুযোগ পেলো। তারা তার উপর আক্রমণ করলো এবং দারুণভাবে জখম করে তাই ছাড়লো। সে আহত হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে ছিলো। তখন এক লোক তার অবস্থা দেখে বলল,

- হাই আল্লাহ তুমি ছাগলটাকে এমন হালকা-পাতলা শরীর দিয়েছো বলেই তো সে মার খেয়েছে।

ছাগলটা অনেক কষ্টে মাথা তুলে বলল,

- আল্লাহকে দোষ দিয়ো না। হালকা শরীর যেমন তিনি দিয়েছিলেন তেমনই সুন্দর দুটি শিঙও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি শত্রুর কথা শুনে নিজে হাতে সেই শিঙ নষ্ট করেছি তাই আজ আমার এই দশা। সব দোষ তাই আমারই।

- মোল্লারাও কাফির-মুশরিকদের কথা শুনে নিজেদের শিঙ ভেঙে ফেলেছে তাই তো শিঙভাঙা হুজুরদের পরাজিত করা এখন মামুলী ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু আজ দেখবে শিঙওয়ালা মোল্লার খেল।

কথাটা বলেই রিয়াদ আতিকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। আতিকও তার সাথে তাল মিলিয়ে হাসার ভান করে। তার মনের মাঝে এখনও ভয় ভয় করছে। কি জানি কি হয়।

ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো। সোহেল দাড়িয়ে স্বেচ্ছায় উপস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করলো,

- আমি আলোচকদের আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি। এক পক্ষে আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদাজান আর অন্য পক্ষে তারই স্নেহাস্পদ নাতি। এবার শুরু হবে দাদা ও নাতির লড়াই।

এসব কথা শুনে দাদা তার দিকে কটমট করে তাকালেন। বিষয়টা একটু অতিরঞ্জন হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সোহেল কিছুটা সংযত হয়। দাদাজান শিমুলের হাত ধরে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করলেন আর রিয়াদ আসন

গ্রহণের জন্য উঠে দাড়াতেই আতিক এসে তার হাত চেপে ধরে মঞ্চ পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

বিতর্কের শুরুতেই কোনোরূপ নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই মুজিবুল হোক রিয়াদের দিকে প্রশ্ন ছুড়লেন,

- ইসলাম যদি সত্য ধর্মই হয় তবে অন্য ধর্মের লোকদের উপর আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করে কেনো? কেনো তাদের কাছে জিজিয়া নামের জরিমানা আদায় করে? হত্যা করে তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় করেই বা দেয় কেনো?

কথাটা বলে তিনি ঐসব কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন যাতে ইসলাম কাফিরদের উপর আগে আক্রমণ করে এটা প্রমাণিত হয়। নবী সুলাইমানের কাহিনী, কাদিসিয়ার যুদ্ধ ইত্যাদি নানা ঘটনা উল্লেখ করে তিনি তার দাবীকে শক্ত করার চেষ্টা করেন। এমনকি শেষে একটা অনিয়মও করে ফেলেন। বিতর্কের শুরুতেই আতিক রিয়াদের পক্ষে যোগ দিয়েছে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও তিনি হঠাৎ তাকে ডেকে বলেন,

- তোমার বই-পুস্তকগুলো নিয়ে এসো।

আতিক দ্রুত ছুটে গিয়ে আরবী আর উর্দু বইগুলো নিয়ে

আসে। মুজিবুল হক তাকে স্থানে স্থানে পাঠ করে অনুবাদ করে গুনিয়ে দিতে বললেন। সে তাই করলো। এরপর রিয়াদের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হেসে মুজিবুল হক বললেন,

- এখন বলো, ইসলাম যে কাফিরদের আগে আক্রমণ করে সেটা তুমি কিভাবে অস্বীকার করবে?

রিয়াদ খুব স্বাভাবিকভাবে বলে,

- এটা তো প্রমাণিত সত্য তা অস্বীকার করার কি আছে?

উপস্থিত নাস্তিকরা চিৎকার করে শ্লোগান দিয়ে উঠলো,

- দাদাজান জিন্দাবাদ। নাস্তিকতা, জিন্দাবাদ।

দাদাজান তাদের দিকে চোখ কটমট করে তাকালে তারা শ্লোগানটা সংশোধন করে নিয়ে বলল,

- দাদাজান, জ্যান্ত থাক। নাস্তিকতা জ্যান্ত থাক।

জিন্দাবাদকে বাংলায় জ্যান্ত থাক অনুবাদ করা রাতুলের বুদ্ধি। দাদাজানও বিষয়টিতে আপত্তি করলেন না। কেবল রিয়াদের দিকে তাকিয়ে বলেন,

- অন্য ধর্মের প্রতি এমন অসহিষ্ণু আচরণ করার পরও তুমি বলবে ইসলাম সত্য ধর্ম?

মুচকি হেসে রিয়াদ বলে,

- এই কারণেই তো আমি বলবো ইসলাম সত্য ধর্ম। এর উল্টো হলেই বরং আমি সন্দেহ করতাম ইসলাম সত্য ধর্ম কিনা।

কথাটা শুনে দাদাজান তো আকাশ থেকে পড়লেন। উপস্থিত দর্শকরাও বেজাই বিস্মিত হলো। এ কেমন উদ্ভট কথা। উদ্ভট কথাটা হজম করার জন্য যতটা সময় দরকার তা অতিবাহিত হওয়ার পর দাদা বলেন,

- কিভাবে?

রিয়াদ বিষয়টি সহজে বোঝানোর চেষ্টা করে,

- প্রথমেই একটা গল্প বলি। একবার দুজন কৃষক রাজার নিকট এক খন্ড জমির ব্যাপারে বিচারপ্রার্থী হলো। উভয়ের দাবী ছিলো জমিটা তার। রাজা খুব বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে জমিটা দুজনে আধাআধি করে ভাগ করে নাও। এই বিচার শুনেই একলোক বলে উঠলো,

- জাহাপনার জয় হোক।

অন্য কৃষক আক্ষেপ করে বলল,

- হে আল্লাহ এ কেমন অন্যায়? দুনিয়া থেকে কি ইনসাফ উঠে গেলো!

একটু থেমে রিয়াদ বলে,

- চিন্তা করে বলুন তো এদের মধ্যে জমির আসল মালিক কে?

দাদাজান বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। অন্য কারও কথা বলার অনুমতি ছিলো না। তাই তারা বুঝতে পেরেছে কিনা তাও বোঝা গেলো না। রিয়াদ তখন গল্পের পরের অংশটি বলতে শুরু করে।

একথা শুনে প্রথম লোকটি বলল,

- জাহাপনা। এতো বড় সাহস! সে কিনা আপনার বিচারকে অন্যায় বলে। এখনই তাকে শূলে চড়িয়ে দিন।

রাজা সিপাইকে ডেকে প্রথম লোকটার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন,

- এই লোককে কয়েদ করো।

লোকটি অবাক হয়ে বলল,

- আমি আপনার বিচার মেনে নিয়েছি তবু আমাকেই
কয়েদ করছেন?

রাজা হেসে বললেন,

- তুমি মিথ্যাবাদী। জমি তোমার নয়।

লোকটা অবাক হয়ে বলে,

- কিভাবে বুঝলেন?

রাজা বলে,

- জমি যার নয় সে ভাগাভাগি করে যা পায় তাতেই খুশি
হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জমিটা আসলে যার সে
সম্পূর্ণ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই খুশি হবে না।

গল্পটি শেষ করতেই উপস্থিত সবাই সহাস্যে বলল,

- ঠিকই তো।

দাদাজান নিজেও মাথা ঝাকিয়ে বললেন,

- সঠিক বিচারই হয়েছে বটে। কিন্তু এর সাথে বিতর্কের বিষয়বস্তুর কি সম্পর্ক?

রিয়াদ তখন বিষয়টি বুঝিয়ে বলে,

- দেখুন ইসলাম বলছে আল্লাহই হলেন সব কিছুর স্রষ্টা। তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। ইসলাম হলো তার পক্ষ থেকে প্রেরিত একমাত্র সত্য ধর্ম। বাকি সব ধর্ম মিথ্যা। এ দাবী সত্য হলে অন্য ধর্মের সাথে ইসলামের কেমন আচরণ করা উচিত? ভাগাভাগি করে মিলেমিশে থাকা নাকি তাদের বিদায় করে দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথিবীটা একা দখল করা?

দাদাজানের বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। মনে হচ্ছে তার হাত থেকে দড়ি ফসকে যাচ্ছে। উত্তর কি হবে তা বুঝতে পারার পরও তিনি বেশ কিছুক্ষণ তাই নিরব থাকেন। তাকে নিরব দেখে রিয়াদ বলে,

- যে দাবী করছে পৃথিবী আমার। পৃথিবীর বুকে যারা তার অবাধ্য হয়েছে অর্থাৎ কাফির মুশরিক আর নাস্তিক মুরতাদরা তাদের শাস্তিবিধান করাটাই কি তার জন্য স্বাভাবিক নয়? তা না করে সে যদি তাদের জামাই আদর

করে সাদরে সম্ভাষণ জানায় তবে সে আসলেই পৃথিবীর মালিক কিনা সে ব্যাপারেই কি সন্দেহের সৃষ্টি হয় না? এই যেমন ধরুন এই বাড়িটি আপনার। এখানে আপনি আতিককে স্থান দিয়েছেন। এখন যদি বুঝতে পারেন সে এখানে বসে আপনারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। বা প্রকাশ্য সমাবেশে আপনাকে গালি-গালাজ করছে, নাজাস কমিটির সদস্যদের ধর্মাত্মক মোল্লা হয়ে যাওয়ার জন্য দা'ওয়াত দিচ্ছে তবে আপনি কি করবেন?

দাদাজান রাগত স্বরে বললেন,

- তাকে ঘাড়ে থাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবো।

রিয়াদ মুচকি হেসে বলে,

- এই তো বাড়ির মালিকের মতো কথা। তো সেই একই ভাবে স্রষ্টা যদি পৃথিবীর বুক থেকে কুফরী ধর্ম বিশ্বাস আর কাফির মুশরিকদের বিলুপ্ত করার নির্দেশ দেন তবে সেটাই অধিক যৌক্তিক নয় কি? ইসলাম এমন যৌক্তিক কথাই বলেছে। একারণেই তো রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ কালেমা পাঠ করে মুসলিম না হওয়ার পর্যন্ত তাদের সাথে আমাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে।” এটাই হলো আসল মালিকের কথা। যেহেতু জমি তার তাই তার এক বিন্দু পরিমাণ প্রতিপক্ষের দখলে চলে যাক তা সে চাইবে না। তারই জমিতে বসে তারই সাথে শেরেক কুফর করার মতো অন্যায় তিনি সহিবেন না। এটাই স্বাভাবিক। আর ভিন্ন মতের লোকেরা এখানে জবরদখলকারী চাষীর মতো আচরণ করছে। তারা বলছে ভাগাভাগি করে মিলেমিশে থাকার কথা। যেহেতু জমি তাদের নয় তাই কোনো মতে একটা অংশ পেলেই তারা খুশি। কেবল তাই নয় তারা চাই ইসলামও তাদের স্থানে নেমে আসুক। নিজেকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে দাবী করার বদলে অন্য সকল ধর্মকে নিজের শরীক হিসেবে মেনে নিক। ভাগাভাগি করে মিলেমিশে থাকুক। হতভাগা মোল্লারা এই দাবী মেনে নিয়েছে তাই তো তারা সেদিন বিতর্কে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু আপনি নিজে দাবী করেছেন আর আতিকের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রকৃত ইসলাম এ দাবী মানেন না। বরং নিজেকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবেই দাবী করে। আর অন্য সকল ধর্মকে বাতিল হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাই তো অন্য ধর্মের সাথে ভাগাভাগি নয় বরং পৃথিবী থেকে তাদের ভাগিয়ে দেওয়াই ইসলামের নির্দেশ। সহীহ

বুখারীর অন্য হাদীসে এসেছে রসুল ﷺ বলেছেন, আমিই বিনাশকারী আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরীকে বিনাশ করবেন। সহী মুসলিম ও মুস্তাদরাকে হাকিম নামক কিতাবে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো আপনাকে কি মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, অন্য সকল ধর্মকে ভেঙে ফেলার জন্য। এটাই প্রমাণ করে ইসলামের কথা ও কাজে মিল রয়েছে। যে নিজেকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে দাবী করে তার পক্ষে এ ছাড়া অন্য কোনো কথা কি মানায়?

কথাটা শুনে দাদা পুরা নিরব হয়ে গেলেন। তিনি গোড়া নাস্তিক বটে কিন্তু সাধারণ যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে নাস্তিকতার পক্ষে ছাফাই গাইবার মতো নিচু কাজ করতে পারবেন না। রিয়াদের কথার বিপরীতে তাই তিনি অনেক চেষ্টা করেও কিছুই বলতে পারলেন না। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। সেদিন মুফতি সাহেবকে অত সহজে হারিয়ে দিলেন অথচ আজ রিয়াদের কাছে তার এই হাল কেনো হচ্ছে।

আতিক অবশ্য মুখ টিপে টিপে হাসছে। এতক্ষণে সে শিঙ ভাঙার গল্পটার অর্থ বুঝতে পেরেছে। শিঙ ওয়ালা

মোল্লার শিঙের গুতোই দাদাজানের শরীর যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে সেটাও সে অনুভব করতে পারে। সত্যিই তো! ইসলামকে যদি পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় তবে কি আর বাতিলপন্থীরা তর্কে বিজয় অর্জন করতে পারে?

বেশ কিছুক্ষণ মনে মনে চেষ্টা করার পর মুজিবুল হক বিতর্ক চালিয়ে যাওয়ার মতো কিছু মাল মসলা সংগ্রহ করে ফেললেন। তিনি বুঝতে পারেন রিয়াদকে ভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে। কপাল নাচিয়ে বললেন,

- সত্য ধর্ম হিসেবে ইসলাম অন্য সকল বাতিল ধর্মবিশ্বাসকে বিনাশ করবে এর যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করছি। প্রশ্ন হলো, তাহলে জিজিয়া গ্রহণের মাধ্যমে ইসলাম কাফিরদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের সুযোগ কেনো দিচ্ছে? কেনোই বা বলছে দ্বীনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই? আবার বলছে রসুল রহমাতুল লিল আলামীন

দাদাজান এক নাগাড়ে বলতে থাকেন। মনে হচ্ছে পরাজয়ের আশঙ্কায় তিনি হিস্ট্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। রিয়াদ তাকে থামিয়ে বলে,

- সবগুলো প্রশ্নের উত্তর তো আর একবারে দেওয়া সম্ভব নয় একটা একটা করে দিই।

মুজিবুল হক হাতের ইশারায় জানিয়ে দেন তাতে তার কোনো আপত্তি নেই। সম্মতি পেয়ে রিয়াদ শুরু করে,

- ইসলাম যদি শেরেক-কুফরের বিনাশই চায় তবে জিজিয়া করার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে শেরেক-কুফরে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দেয় কেনো? অত্যন্ত সুন্দর একটা প্রশ্ন। প্রশ্ন আসলে এমনই হওয়া উচিত। ঘরের মালিক অনৈতিক কাজ করলে কাউকে ঘর থেকে বের করে দেবে কেনো এমন প্রশ্ন মোটেও যৌক্তিক নয় বরং যৌক্তিক হলো, এমন ব্যক্তিকে ঘরের মালিক ঘর থেকে বের করে দেবে না কেনো সেই প্রশ্ন করা। দাদাজান এখন সেই প্রশ্ন করেছেন। তার এই অগ্রগতিকে আমি সাধুবাদ জানায়। বলে আতিকের দিকে চোখের ইশারা করতেই সে বলে ওঠে,

- দাদাজান জ্যান্ত থাক, দাদাজান জ্যান্ত থাক।

তার সাথে তাল মিলিয়ে অন্যরাও স্লোগান দিয়ে ওঠে। এই অতিভক্তিকে দাদাজান কিভাবে গ্রহণ করলেন তা

বোঝা গেলো না। তিনি অবশ্য কোনো কথাই বললেন না। এমনকি নড়া চড়াও করলেন না। কেবলই অধীর আত্মহে অপেক্ষা করতে লাগলেন রিয়াদের মুখে উত্তর শোনার জন্য। স্লোগান থেমে গেলে রিয়াদ শুরু করে,

- এই প্রশ্নটিই আমাকে বেশ কিছুদিন ভুগিয়েছে। শেষে আতিকের নিয়ে আসা বইগুলোর মধ্যে আমি এর উত্তর পেয়েছি। আসলে পূর্ববর্তী আলেমদের অন্তরেও এই প্রশ্ন উদয় হয়েছে আর তারা এর উত্তরও দিয়েছেন।

মুজিবুল হক অবাক হয়ে বলেন,

- তাই নাকি?

মনে মনে খুব গর্ব অনুভূত হয় তার। তিনি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন যা পূর্বযুগের আলেমদের মনেও উদয় হয়েছিলো। এটা ভেবে নিজেকে অনেক বড় মনে হয় তার কাছে। পরে অবশ্য মনে পড়ে যায় প্রশ্নটার সমাধানও হয়ে গেছে আগেই। এটা ভেবে তার অহংকারে কিছুটা ভাটা পড়লেও উত্তরটা জানার জন্য কৌতুহলের কোনো ঘাটতি পড়ে না। নিরাবতা ভেঙে রিয়াদ বলে,

- প্রথম কথা হলো, জিজিয়ার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ধর্ম

পালন করতে দেওয়া হয় কথাটা ভুল। জিজিয়ার আয়াতেই অপমানিত অবস্থায় জিজিয়া প্রদানের কথা উল্লেখিত আছে। তারাই ধারাবাহিকতায় চার খলীফা ও অন্যান্য ওলামায়ে দ্বীনের মতামত হলো, জিজিয়া প্রদান করে কাফির-মুশরিকরা সীমিত পরিসরে ধর্ম পালন করতে পারবে। তবে তাদের উপর নানারকম বাধানিষেধ আরোপ করা হবে। যেমন, তারা প্রকাশ্যে ধর্ম পালন করবে না, নিজেদের ধর্মের দা'ওয়াত দিতে পারবে না, ইসলামী রাষ্ট্রের বড় কোনো পদ পাবে না ইত্যাদি। এমন বৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো যে ধর্মের কারণে তারা নানাবিধা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বাৎসরিক জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য হচ্ছে ধীরে ধীরে তারা যেনো সে ধর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে তা পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। জিজিয়ার কারণে অমুসলিমদের উপর যেসব বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় তার উপর চিন্তা করলে ফলাফলে এমনটাই যে ঘটবে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না। এছাড়া জিজিয়ার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বসবাসের সুযোগ দিয়ে ইসলামের সৌন্দর্য কাছ থেকে উপলব্ধি করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। শেরেক-কুফর পরিত্যাগ

করে ইসলাম গ্রহণে এই বিষয়টিও ভূমিকা রাখে। মোট কথা স্বাধীনভাবে কুফরীর উপর চিরটাকাল টিকে থাকা নয় বরং ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে টেনে আনার জন্য জিজিয়া করের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায় কুফরীকে বিনাশ করার যে মিশন নিয়ে রসুল ﷺ আগমন করেছেন জিজিয়ার বিধান তারই একটি অংশ, বিপরীত কোনো বিষয় নয়।

রিয়াদের পান্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা শুনে দাদাজান খুশিও হলেন আবার রেগেও গেলেন। যে প্রশ্নের উত্তর মুফতি সাহেবরা দিতে পারেননি সেই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর যে তারই নাতি নিজ মুখে বয়ান করছে এটা ভেবে তার গর্বের সীমা রইলো না কিন্তু যখনই মনে পড়লো সেই নাতি এখন তারই বিপক্ষে বিতর্ক করছে তখন তার রাগও কম হলো না। সেই রাগকে প্রাধান্য দিয়ে রাগত স্বরেই বললেন,

- আর ঐ যে স্পষ্ট বলা হচ্ছে “দ্বীনের মধ্যে কোনো জবরদস্তির নেই” – এইটার কি হবে?

রিয়াদ বুঝতে পারে ধীরে ধীরে দাদাজানের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। অর্ধশত বছরের ইতিহাসে এই

প্রথম তিনি বিতর্কে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পরিত্যাগ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। এতে মনে মনে রিয়াদ খুব মজা পায়। মুচকি হাসির মাধ্যমে সেই মজাটা বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে সে বলে,

- এই প্রশ্নটা আমার কাছে খুব জটিল মনে হয়েছিলো কিন্তু আতিকের বইয়ের মধ্যে এর খুব সহজ একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো।

দাদাজান নিজেও আশা করেছিলেন প্রশ্নটা বেশ জটিল হবে। কিন্তু এরও সহজ উত্তর আছে জানতে পেরে তিনি একদিকে যেমন বিরক্ত হলেন কিছুটা আতঙ্কিতও হলেন। মনে মনে আতিকের উপর খুব রাগ হলো তার। ঐ হতচ্ছাড়াটা বইগুলো না আনলে কি আর আজ তাকে এভাবে বিতর্কে হারতে হতো? তবে সত্যের প্রতি অসীম আগ্রহ তাকে প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আগ্রহী করে তোলে। কৌতুহলী হয়ে বলেন,

- সেই সহজ ব্যাখ্যাটা কি?

রিয়াদ বলে,

- ইমাম বাইদাবী বলেছেন, দ্বীনের কারণে যে জবদস্তি

করা হয় সেটা আসলে জ্বরদস্তিই নয়। যেহেতু কল্যাণের কাজে কাউকে বাধ্য করা হলে তাকে জ্বরদস্তি বলে না। যেমন বাবা যদি সন্তানকে জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয় তবে তাকে জ্বরদস্তি বলা যায় না। তাই না? এখন যেসেব লোকেরা শেরেক-কুফর করে জাহান্নামে চলে যাচ্ছে জোর করে তাদের যদি ফেরানো যায় তবে তাকে কি আর জ্বরদস্তি বলে?

দাদাজান পুরা নিরব হয়ে গেলেন। এমন যৌক্তিক কথার বিপরীতে তিনি কিই বা বলবেন।

আতিকও বেশ অবাক হলো। গত কয়েকদিন ধরে সে রিয়াদকে কয়েকটা উর্দু কিতাব পাঠ করে শুনিয়েছে। সে উর্দু পড়তে পারে না তবে হিন্দি বোঝে তাই আতিক কেবল পাঠ করলেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থটা সে বুঝে নিয়েছে। কোনো সমস্যা হলে মাঝেমাঝে আতিক ব্যাখ্যাও করে দিয়েছে। সেখান থেকেই সে নাস্তিকদের ঘায়েল করার মতো মাল-মশলা খুঁজে নিয়েছে। আতিক নিজেও এগুলো পড়েছে কিন্তু নাস্তিকদের বিরুদ্ধে এগুলো যে কোনো অস্ত্র হতে পারে তা কল্পনাও করেনি। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী আলেমদের কিতাবে যা আছে

নাস্তিকদের ঘায়েল করার জন্য তাই যথেষ্ট। কিন্তু এ যুগের মোল্লারা সেসব জ্ঞানের কথা পরিত্যাগ করে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো বিদয়াতী চিন্তাধারাতে বিশ্বাসী হয়েছে বলেই নাস্তিক মুরতাদদের হাতে পরাজিত হচ্ছে। মোল্লাদের উপর রাগে আর রিয়াদের উপর অনুরাগে তার মনটা তাই ভরে যায়। তার ঐ আয়াতটি মনে পড়ে যায় যেখানে বলা হয়েছে অনেক আলেম গাধার মতো জ্ঞানের কিতাব বহন করছে বটে কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারেনা।

কিছুক্ষণ নিরব থেকে দাদাজান বললেন,

- আর একটা বিষয় আছে। ঐ যে রহমাতুল লিল আলামীন।

- ও হ্যা। এটাও তো আপনার প্রশ্ন ছিলো। তা এতক্ষণের আলোচনায় এর উত্তরও অবশ্য পেয়ে যাওয়ার কথা।

তার কথার প্যাঁচ দাদাজান ধরতে পারেন না। আতিক নিজেও কিছু বুঝে উঠতে পারে না। আতিকের দিকে আঙ্গুলি নাচিয়ে রিয়াদ বলে,

- ঐ যে শাহ ওলীউল্লাহ দেহলাবী কি বলেছেন, মনে

নেই?

আতিক মাথা নাড়ে তার কিছু মনে নেই। রিয়াদ বলতে থাকে,

- তিনি হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা কিতাবে বলেছেন, ঔষধ খেতে চায় না এমন রুগীকে জোর করে তেতো ঔষধ খাইয়ে দেওয়া যেমন তার উপর দয়া দেখানো বলেই গণ্য তেমনি স্বেচ্ছায় যে হকের উপর আসে না তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া রহমত বা দয়ার প্রকাশ নয় বরং তার উপর দয়া প্রকাশের চূড়ান্ত রূপ হলো তাকে জোর করে হকের পথে নিয়ে আসা।

এতক্ষণে আতীকের কথাটা মনে পড়ে আর সাথে সাথেই তার মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। তাই তো! কত সুন্দর কথা। কিছুক্ষণ নিরব থেকে রিয়াদ বলতে থাকে,

- ধরুন আপনি অত্যন্ত দয়ালু মানুষ। আপনার সামনে কেউ আগুনে ঝাপ দিচ্ছে। আপনি কি করবেন?

দাদাজান প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু রিয়াদ বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললেন,

- তাকে বাধা দেবো।

মুচকি হেসে রিয়াদ বলে,

- যে রসুল নিজে মুখে বলেছেন শেরেক-কুফর করলে
মানুষ জাহান্নামী হবে তিনি মানুষকে স্বাধীনভাবে শেরেক-
কুফরে লিপ্ত থাকতে দিলে সেটা কি রহমত হয়! বরং
তিনি জোর করে তাদের শেরেক কুফর থেকে ফেরানোর
চেষ্টা করবেন তাই তো তিনি দয়ার নবী রহমাতুল লিল
আলামীন। কি সুন্দর মিল যাচ্ছে তাই না!

কথাটা শুনে আতিক নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে
না। চিৎকার করে বলে,

- দ্বীন ইসলাম, জিন্দাবাদ। রিয়াদ ভাই জিন্দাবাদ।

দাদাজান তার দিকে চোখ কটমট করে তাকালে সে জোর
করে নিজেকে সামলে নেয়। দাদাজান তখন মুখটা ভেংচে
বলেন,

- তাই বলে যুদ্ধ বিগ্রহ করে মানুষ খুন করতে হবে।

হালকা হেসে রিয়াদ বলে,

- একটা লোক যদি শত সহস্র লোককে জাহান্নামের
দিকে টেনে নিয়ে যায় আর ঐ একটা লোককে হত্যা

করলে যদি সকলে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায় তবে প্রয়োজনে তাই করতে হবে। জনগনের শান্তি রক্ষার খাতিরে ডাকাত বা সন্ত্রাসীদের হত্যা করা হয় না? এ দায়িত্ব যারা পালন করে তাদের তো জনদরদী বীরপুরুষই বলা হবে নাকি? তেমনই যাদের কারণে মানুষ আখিরাতের জীবনে চিরস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের হত্যা করে জাহান্নাম থেকে মানুষকে বাঁচানোর দায়িত্ব যিনি পালন করবেন তাকে তো রহমাতুল লিল আলামীনই বলা হবে।

মুজিবুল হক আর কিছুই বলতে পারলেন না। রিয়াদের যুক্তি খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই। এতদিন যে বিষয়কে তিনি দোষ মনে করেছেন এখন দেখা যাচ্ছে সেটাই ইসলামের গুণ সেটাই তার মহত্ব। মনে হচ্ছে মহাবিশ্বের স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্ম এমনই হওয়া উচিত। সত্য ধর্ম বাতিলের সাথে আপোস-রফা করবে বা ভাগাভাগি করে মিলেমিশে থাকবে এটাই তো অযৌক্তিক। বিপরীতে বাতিলকে বিনাশ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই তো মনে হচ্ছে যৌক্তিক। কি আশ্চর্য! তবে কি তাকে আজ নাস্তিকতা

পরিত্যাগ করতেই হবে। তখনই রিয়াদ বলে ওঠে,

- সেই রহমত বা দয়ার কারণেই আমিও বলছি দাদু তুমি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ছায় হবে এটা আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে। তার চেয়ে বরং তাওবা পড়ে মুসলিম হয়ে যাও।

কথাটা শুনে মুজিবুল হকের ভিতরটা দপ করে জ্বলে ওঠে। এখনও বিষয়টা মেনে নিতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে আরো একটা প্রশ্ন মনে পড়ে তার। ডুবে যাওয়া ব্যক্তি যেভাবে ঘাস পাতা আকড়ে ধরেও বাঁচতে চায় তিনি শেষ চেষ্টা হিসেবে সেই প্রশ্নটিই ছুড়ে দেন রিয়াদের প্রতি।

- ইসলাম যদি স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত ধর্মই হবে তবে নারী-পুরুষে বৈষম্য কেনো?

কথাটা বলে নারী পুরুষে বৈষম্য করা হয়েছে এমন কিছু দলীল প্রমাণ পেশ করলেন তিনি। রিয়াদ ধৈর্য ধরে সেগুলো শোনার পর বলে,

- কেবল নারী পুরুষ নয়। আরো অনেক বৈষম্য আছে। এই যে দেখো, কেউ ধনী কেউ গরীব, কেউ লম্বা কেউ

বেটে, কেউ ফর্সা কেউ কালো। কেউ কানা কেউ খোড়া।
সৃষ্টির মাঝে আরও কত রকম বৈষম্য রয়েছে।

রিয়াদের মুখে এসব কথা শুনে মুজিবুল হক ভীষণ খুশি
হলেন। তিনি নিজেও এত বৈষম্য নিয়ে ভাবেননি
কখনও। নিজের অজান্তেই মুখের সবগুলো দাত বের
করে বললেন,

- তাহলে বোঝো। এটা কি স্রষ্টার কাজ হলো?

রিয়াদ মুচকি হেসে বলে,

- এটাই তো স্রষ্টার কাজ।

মুজিবুল হক আবারো হতবাক হয়ে গেলেন।

- এটাই স্রষ্টার কাজ?

- অবশ্যই তাই। স্রষ্টা যে সর্ব শক্তিমান এবং যার সাথে
যেমন খুশি আচরণ করার ক্ষমতা যে তার আছে এটা
তো তারই প্রমাণ। যে জিনিসের একক মালিকানা
আপনার এবং তার উপর আপনার একছত্র কর্তৃত্ব সে
জিনিস কাউকে কম আর কাউকে বেশি দিলে তাতে
দুর্নীতি হয় না বরং আপনার সর্বময় ক্ষমতারই প্রমাণ

পাওয়া যায়। এই যে আপনি আপনার সম্পদ থেকে নাজাস কমিটির সদস্যদের ভাতা দেন। সবাইকে তো আপনি সমান দেন না। এটা কি অন্যায়?

মুজিবুল হক কিছুক্ষণ নিরব থাকেন। তিনি সবাইকে সমান ভাতা দেন না এটা বিলক্ষণ সত্য। মাঝে মাঝে যোগ্যতার বলে কম-বেশি করেন আবার কখনও কেবল নিজের খেয়াল-খুশির উপর নির্ভর করে যাকে ইচ্ছা অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করেন। কিন্তু বিষয়টা কখনও তার নিকট অন্যায় বলে তো মনে হয়নি। এখনও মনে হচ্ছে না। সত্য কথাটাই তিনি স্বীকার করলেন,

- না এটা মোটেও অন্যায় নয়।

রিয়াদ অবাক হওয়ার ভান করে বলে,

- কেনো অন্যায় হবে না?

মুজিবুল হক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন,

- আমার সম্পদ আমি যাকে খুশি কম বা বেশি প্রদান করবো এতে অন্যায় হওয়ার কি আছে। কম-বেশি যাই হোক প্রদান যে করছি এতেই তো তাদের খুশি হওয়া উচিত।

রিয়াদ বলে,

- ঠিকই বলেছেন। সম্পদের মালিক যে আপনি এবং তার উপর আপনারই যে একছত্র অধিকার এটা মেনে নিলে আপনার এ কাজকে কোনো বুদ্ধিমান লোক অন্যায় বলতে পারবে না। আর যে বলে সবাইকে সমান দিতে হবে, না হলে অন্যায় হবে সে যেনো সম্পদের মালিকানা বা সম্পদের উপর কর্তৃত্ব যে আপনার সেটাই অস্বীকার করছে। স্রষ্টার ক্ষেত্রে এমন অস্বীকার কুফরী হিসেবে গণ্য। যেহেতু, ঈমানের দাবীই হলো সম্পদ বা অন্য যে কোনো ব্যাপারে স্রষ্টার একক মালিকানা এবং একছত্র কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেওয়া। ফলে স্রষ্টা সবার মাঝে সমতা বিধান করতে বাধ্য এমন দাবী অযৌক্তিক বরং কুফরীর শামিল। আর তিনি যাকে ইচ্ছা কম বা বেশি প্রদান করতে পারেন সেটাই যৌক্তিক চিন্তাধারা। মহান আল্লাহ তাই সবাইকে সমান দেবো বা সবাইকে সমান দিতে আমি বাধ্য এমন বলেন নি। বরং সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, “দেখুন না আমি কিভাবে তাদের কাউকে কম আর কাউকে বেশি দিয়েছি” [বনী ইসরাঈল/২১] এভাবেই তিনি তার একছত্র কর্তৃত্বের প্রমাণ পেশ করেছেন।

বিপরীতে বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “আমি কাউকে বেশি প্রদান করলে অন্যরা যেনো তা কামনা না করে।” [সূরা নিসা/৩২] অর্থাৎ আমি তো কম বেশি করতেই পারি। যেহেতু আমি স্রষ্টা। অতএব সমান দাও বা সমান দিতে হবে এমন দাবি আমার ক্ষেত্রে খাটে না। বরং সবার উচিত আমার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া এবং যাকে যা দিয়েছে তা পেয়ে সন্তুষ্ট হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যাবে ইসলাম স্রষ্টাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেছে। তাই ইসলামের এই বৈষম্যের নীতি থেকে আমি আরো একবার প্রমাণ পেয়েছি ইসলাম স্রষ্টার পক্ষ থেকেই প্রেরিত হয়েছে।

চোখের সামনে শেষ প্রশ্নটির উপযুক্ত সমাধান হতে দেখে মুজিবুল হোক আতংকে শিউরে ওঠেন। তার হাতে আর কোনো প্রশ্ন নেই। এখন বাকী আছে কেবল তওবা করে নাস্তিকতা থেকে ফিরে আসা। ভীষণ আতংকে তার শরীরটা শিউরে ওঠে।

মনে মনে তিনি ভাবেন,

- আমি নাস্তিক সম্রাট কমরেড মুজিবুল হক। আমি তওবা করে মোল্লা হয়ে যাবো। আর মোল্লারা লাল দাত বের

করে হি হি করে হাসবে। এ জীবনে সে সৌভাগ্য
মোল্লাদের হবে না।

তখনই তার মনে পড়ে যায় রিয়াদর সাথে কৃত ওয়াদার
কথা। তিনি আবার ওয়াদা ভঙ্গ করার বিষয়টা ভীষণ
অপছন্দ করেন। কিভাবে একটা গোলোযোগ সৃষ্টি করা
যায় সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবেন। তারপর হঠাৎ একটা
ফন্দি এসে যায় তার মাথায়।

- ঠিক আছে তওবা আমি করবো তবে আমার সাথে
মোল্লাদেরও তওবা করতে হবে।

রিয়াদ অবাক হয়ে বলে,

- তারা আবার কি তওবা করবে?

দাদা বিষয়টা বুঝিয়ে বলেন,

- কেনো মনে নেই? আর কখনও এতীমের সম্পদ
অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করব না, দ্বীনের জ্ঞান গোপন করবে
না এই সব।

কথাটা শুনে রিয়াদ আমতা আমতা করতে থাকে কিন্তু
আতিকের বিষয়টি খুব পছন্দ হয়। ঠিকই তো। নাস্তিকরা

তো আর এমনি এমনি নাস্তিক হচ্ছে না। হুজুররা ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না বলেই তারা নাস্তিক হচ্ছে। তাছাড়া হুজুরদের অন্যায় কীর্তি কলাপ দেখেও অনেকে রাগ করে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। অতএব, নাস্তিকদের সাথে সাথে তাদেরও তওবা করা উচিত। ভীষণ উৎসাহী হয়ে সে বলে,

- দাদু ঠিকই বলেছে। হুজুরদেরও তওবা করতে হবে।

উপস্থিত নাজাস কমিটির সদস্যরাও সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো।

- ঠিক, ঠিক। এটাই ঠিক।

অগত্যা রিয়াদ বিষয়টি মেনে নিলো। দাদাজানকে বলল আপনি মোল্লাদের কাছে একটা চিঠি লেখেন। তাতে লিখবেন তারা তওবা করলে আপনিও তওবা করবেন আর যদি তারা তওবা না করে তবে আবারো তাদের থানায় ডেকে বিতর্ক করবেন। দাদা এই মর্মে চিঠি লিখে সেই মুফতি সাহেবের কাছে পাঠালেন। তার আবার জমিদারী মেজাজ। চিঠিতে অতিরিক্ত একটা কথাও তিনি যোগ করলেন। লিখলেন,

- এবার বিতর্কে হেরে গেলে মাথা নেড়া করে ঘোল ঢেলে দেবো। তারপর গাধার পিঠে চাপিয়ে সারাটা দেশ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবো।

তার চিঠিতে কাজ হলো। মোল্লারা পাল্টা চিঠিতে তওবা করতে রাজি হলো। যে নাস্তিকের কারণে তাদের এতটা অপমানি আর মানহানী সে নিজেই তাওবা করবে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে। যে এলাকায় প্রথম মোল্লাদের সাথে বিতর্ক হয়েছিলো সেই এলাকাতেই তওবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। তবে এবার থানায় নয় বরং মসজিদে। সবাই অবাক হয়ে দেখলো এক দিকে দাদা আর তার শত শত অনুসারী অন্যদিকে শত শত হুজুর লাইন দিয়ে বসে আছে। মসজিদের ইমাম নিজেও বসেছেন হুজুরদের লাইনে। তিনিও তওবা করতে চান। প্রথমেই দাদাজানের নেতৃত্বে নাজাস কমিটির সদস্যরা তওবা পাঠ করলো,

- আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আল্লাহ এক তার কোনো শরীক নাই। আর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তার প্রেরিত রসুল। সেই সাথে নাস্তিকতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় চিন্তাধারা পরিত্যাগ করিতেছি। সেই সাথে এও ঘোষণা

দিতেছি যে, আমাদের নাজাস নাম বদল করে নাম রাখা হলো, তওবাকারী ইসলামী বাহিনী বা সংক্ষেপে তইবা।

নতুন নাম পেয়ে সকলেই খুশি হলো। যদি তারা জানতো আরবীতে তইবা শব্দের অর্থ পাক বা পবিত্র যা নাপাক বা নাজাস এর বিপরীত তবে হয়তো তারা আরো বেশি খুশি হতো। যাই হোক তাদের তওবা পাঠ শেষ হলে বুড়ো ছজুরের নেতৃত্বে সকল ছজুররা তওবা পাঠ করলো,

- আমরা ওয়াদা করিতেছি যে, এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিব না। যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি ফান্ড হইতে বেতন গ্রহণ করিবো না, দরজা বন্ধ করিয়া মানতের ছাগলের মাংস খাইবো না। দ্বীনের বিধান গোপন করিবো না। শরীয়তের অপব্যখ্যা করিবো না। টাকা দাও, পয়সা দাও স্লোগান তুলে রাস্তা-ঘাটে হাউমাউ করিয়া বেড়াইনো না

তওবা অনুষ্ঠান শেষে উভয় দল একে অপরের সাথে কোলাকুলি করলো। কিছু খানাপিনাও হলো। তখনই দেখা গেলো মুফতি সাহেব দাদাজানের কাছে এসে বলল,

- জমিদার সাহেব আমাদের ছাগল-গরু সবই তো মেরে

দিলেন এবার আমরা খাবো কি?

দাদাজানও জমিদারী কায়দায় বললেন,

- মাসে একটা করে ছাগল আমি মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেবো।

শুনে মুফতি সাহেব কি যে খুশি হলো বলার নয়। লাল দাঁতগুলো বের করে বলল,

- আল্লাহ আপনার মঙ্গল করবেন।

রাগে গজ গজ করতে করতে আতিক বিড়বিড় করে বলে,

- আবার শুরু হলো নতুন কায়দায় ভিক্ষা। এদের আবার তওবা!

রিয়াদ ভাবে,

- তাই তো। ভিক্ষা ছাড়া কি এদের আর কোনো গতি নেই।

তখনই কোথা থেকে বড় আতিক ছুটে এলো। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ছোট ভাইকে বুকে চেপে ধরে বলল,

- তুই ফিরে এসেছিস? তোর জন্য আমি একটা খাসি

মানত করেছি।

ছোট আতিক হেসে বলল,

- তুই খাসি পাবি কোথায়?

- কেনো শুনলি না হুজুররা তওবা করেছে। মানতের খাসি নিজেরা আর খাবে না আমাদের দিয়ে দেবে। সেই খাসি জাবাই করে আমি আমার মানত পুরা করবো।

কথাটা শেষ হতেই দুজনে জড়াজড়ি করে হাসতে থাকে। তখনই দুজনের মাঝে একটা পার্থক্য খুজে পায় রিয়াদ। এক জনের দাঁত লাল আর অন্য জনের দাত লালচে। মানে একজন পান বেশি খায় তাই তার দাঁত পুরাই লাল আর অন্য জন কম খায় তাই তার দাঁত প্রায় লাল। হঠাৎ রিয়াদের চিন্তা ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। আতিক মানে যাকে মুক্ত করা হয়। আজ তার নামের সাথে কাজটা খুব মিলেছে। নাস্তিকতার ভয়াল থাবা থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখন শেষ বিচারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেলেই স্বার্থকতা। কথাটা ভেবে কেনো জানি উদাসীন হয়ে ওঠে রিয়াদের মনটা।

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

গবেষণা গ্রন্থঃ

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান
(তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বালালাহ্
(বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের
রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাক্বু আনিল
মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল
মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও
কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হ্রদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের
বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে
দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা

১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (‘হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!’ বইয়ের জবাব)
১৭. একটি অসম বিতর্কের সুষম সমাধান
১৮. সাহ্ সিজদা
১৯. কুরআন, হাদীস ও চার মাযহাবের মতামতের আলোকে সহজ ফারায়েজ

রিসালাহ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

২০. ছোটদের আক্বাইদ
২১. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
২২. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২৩. মাসায়িলুল ই’তিকাফ (আরবী)
২৪. সংশয় নিরসন (জিহাদ সম্পর্কিত)

ইসলামী উপন্যাস:

২৫. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন)

২৬. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের
জীবন)
২৭. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার
খন্ডায়ন)
২৮. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম
প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৯. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
৩০. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
৩১. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে
নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩২. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার
হাতে বায়াত???)
৩৩. কুরানিক চশমা
৩৪. তওবা

কবিতা গ্রন্থঃ

৩৫. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের
বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
৩৬. কল্পনায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের
জীবন সম্পর্কে কল্পনা)
৩৭. কবিতায় জাহান্নাম (কবিতার ছন্দে জাহান্নামের
শাস্তির বিবরণ)
৩৮. ভন্ড হুজুর (কবিতার ছন্দে নামধারী আলেমদের

ভভামীর বর্ণনা)

ভাষা শিক্ষাঃ

৩৯. তাইসীরুল কওয়্যিদ (আরবী গ্রামার)

৪০. আরাবিয়াতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)